ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে

ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই আশ্বিন,
১৮৮৩ শকাব্দ

দু টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীঅজিত ঘোষ, শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ সেন
স্নেহাস্পদেষু

'বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'

রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টংকারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে।

—মাইকেল মধুসূদন

দেশে দেশে রণরঙ্গিণী রমণীর কাহিনী শোনা যায়,—কেবল কল্পিত গল্পে নয়, সত্যিকার ইতিহাসেও। চলতি কথায় এমন মেয়েকে বলা হয় 'রায়বাঘিনী'।

ভারতের রানী লক্ষ্মীবাঈ, রানী দুর্গাবতী, চাঁদ স্থলতানা, ইংলণ্ডের বোডিসিয়া ও ফ্রান্সের জোয়ান অব আর্ক প্রভৃতি রণরঙ্গিনী বীরনারীর কথা কে না শুনেছে ?

কথিত হয়, সেকালের কাপ্পাডোসিয়ার বীরাঙ্গনারা বাস করত নারীরাজ্যে—যেখানে পুরুষের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। পুরুষদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে কোনদিনই তারা পিছপাও হয়নি। আধুনিক নিউগিনিতেও এমন দেশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মাঝে মাঝে তারা আবার বাইরে হানা দিয়ে পুরুষ দেখলেই বন্দী ক'রে নিয়ে যায়। একালের স্পেন, রুশিয়া ও চীন প্রভৃতি দেশে হাজার হাজার নারী-যোদ্ধার দেখা পাওয়া যায়। এবং এই অতি-আধুনিক যুগেও তিব্বতে শ্রীমতী রিপিয়েডোর্জেস্ প্রায় এক হাজার রণমুখো নারী-যোদ্ধা নিয়ে কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর বীরনারীদের কথা নিয়ে বড় বড় ঐতিহাসিকরা মাথা ঘামান না এবং তার কারণ বোধ হয় তাঁরা হচ্ছেন কালো আফ্রিকার কাজলা মেয়ে।

এঁদের প্রধানার নাম নান্সিকা। আজ এঁরই রক্তাক্ত কাহিনী বর্ণনা করব। কিন্তু তার আগে গুটিকয় গোড়ার কথা বলতে হবে।

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে জনৈক পাশ্চাত্য লেখক The Rising Tide of Colour নামক পুস্তকে সভয়ে এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেন : 'শ্বেতাঙ্গরা এখনো আন্দাজ করতে পারছে না, অশ্বেত জাতিরা (পীত, তাম্র ও কৃষ্ণ বর্ণের) ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে শ্বেতাঙ্গদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। অবিলম্বে তাঁদের সাবধান না হলে চলবে না।

তারপর গত এক যুগের মধ্যেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে—গৌরাঙ্গরা সাবধান হয়েও পীতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

প্রায় সমগ্র এসিয়া থেকেই তাম্র ও পীত বর্ণের প্রভাবে শ্বেতবর্ণ বিলুপ্তপ্রায় হয়েছে এবং তারপর বেঁকে দাঁড়িয়েছে এতকালের পশ্চাদ্-পদ আফ্রিকাও। একে একে শ্বেতাঙ্গদের বেড়ি ভেঙ্গে স্বাধীন হয়েছে মিশর, সুদান, মরক্কো, ঘানা ও কঙ্গো প্রভৃতি আরো কয়েকটি প্রদেশ এবং আরো কোন কোন দেশ প্রস্তুত হয়ে আছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে কিংবা ইতিমধ্যেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করেছে।

সদ্য-স্বাধীন ঘানার প্রতিবেশী ডাহোমি। পশ্চিম আফ্রিকার টোগোল্যাণ্ড ও নাইজিরিয়ার মধ্যবর্তী আটলাণ্টিক সাগর-বিধৌত তটপ্রদেশে আটত্রিশ হাজার বর্গমাইল জায়গা জুড়ে ডাহোমির অবস্থান। তার লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। গত শতাব্দীর

শেষভাগে ফরাসী দস্যুরা হানা দিয়ে ডাহোমির স্বাধীনতা হরণ করেছিল, কিন্তু সম্প্রতি কর্তার চেয়ার ছেড়ে আবার তাদের দর্শকের গ্যালারিতে সরে দাঁড়াতে হয়েছে।

দুই

স্বাধীন ডাহোমির সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল, সেখানে দেশরক্ষা করত পুরুষরা নয়, নারীরা! সাধারণভাবে বলা যায়, ডাহোমির রাজাদের ফৌজে সৈনিকের ব্রত পালন করত সশস্ত্র নারীরা।

আগেই বলা হয়েছে, নারী-ফৌজ কিছু নূতন ব্যাপার নয়। এই শ্রেণীর রণচণ্ডী নারীদের নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যাম্যাজন'। স্পানিয়ার্ডরা দক্ষিণ আমেরিকা আক্রমণ করতে গিয়ে বিভিন্ন নারী-বাহিনীর কাছে বারংবার বাধা পেয়েছিল। তাই তারা সেই দেশের ও সেখানকার প্রধান নদীর নাম দিয়েছিল যথাক্রমে 'অ্যাম্যাজোনিয়া' এবং 'অ্যাম্যাজন'। পৃথিবীতে অ্যাম্যাজন আজও বিখ্যাত নদীগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে—তার দৈর্ঘ্য চার হাজার পাঁচশো এক মাইল।

তবে অন্যান্য দেশে পুরুষদের সঙ্গেই নারীরা যুদ্ধে যোগদান করেছে। কিন্তু ডাহোমির প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের ছায়াও দেখা যায়নি, সেখানে শত্রুদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করেছে কেবল রণরঙ্গিণীরা। সেখানে অ্যাম্যাজনদের নাম হচ্ছে 'আহোসি'। সারা পশ্চিম আফ্রিকায় সকলেই আহোসিদের ভয় করে সত্যসত্যই রায়বাঘিনীর মত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে যখন মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগ, তখনই ডাহোমির নারী সেনাদল গঠিত হয়। প্রথমে রাজা আগাদ্গা বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সৈন্যসংখ্যা বাড়াবার জন্যে ফৌজে পুরুষদের সঙ্গে নারীদেরও সাহায্য গ্রহণ করেন। দেখা যায়, বীরত্বে ও রণনিপুণতায় নারীরা হচ্ছেন অসামান্য। তখন আইন হ'ল, ডাহোমির প্রত্যেক আইবুড়ো মেয়েকে পনরো বছর বয়স হলেই ফৌজে যোগ দিতে হবে। বরাবর চলে আসছে সেই নিয়মই।

আন্দাজ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গেজো সিংহাসন পেয়ে সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল রাজ্য চালনা করেন। তাঁর আগেও ডাহোমির মেয়ে-সেপাইরা অস্ত্র ধ'রে শত্রুনিধন করত বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। রাজা গেজোই সর্বপ্রথমে নারী-বাহিনীকে সুব্যবস্থিত ও অধিকতর শক্তিশালী ক'রে তোলেন এবং তাদের সাহায্যে পার্শ্ববর্তী দেশের পর দেশ জয় ক'রে নিজের পতাকার তলায় আনেন।

সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করবার পর কুমারীদের কঠোর শিক্ষাদীক্ষার ভিতর দিয়ে প্রস্তুত হতে হ'ত—একটু এদিক-ওদিক হলেই ছিল প্রাণ-দণ্ডের আশঙ্কা। কিছুকাল সৈনিকজীবন যাপন করবার পরই তারা কেবল তরবারি, তীর-ধনুক, বল্লম, বন্দুক ও বেওনেট চালনাতেই সুপটু হয়ে উঠত না, উপরন্তু নিয়মিত ব্যায়ামে তাদের দেহও হয়ে উঠত দস্তুরমত বলিষ্ঠ ও পেশীবদ্ধ। একবার এই রণরঙ্গিণীদের বিশজন অরণ্যে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে বধ করেছিল সাত-সাতটা হাতী! সেই থেকে নারী-বাহিনীর একটা বিশেষ দল 'মাতঙ্গমর্দিনীর দল' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

তিন

ব্যাপারটা একবার ভালো ক'রে তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করুন।

একটিমাত্র ক্রুদ্ধ হাতীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় পায় দলে ভারী পুরুষ-শিকারীরাও। কিন্তু বনচর হাতীর পালের সামনে গিয়ে 'যুদ্ধং দেহি' বলে আস্ফালন করতে গেলে যে কতখানি বুকের পাটার দরকার সেটা অনুমান করতে গেলেও হৃৎকম্প হয়!

পাশ্চাত্য শিকারীদের হাতে থাকে অধিকতর শক্তিশালী আধুনিক বন্দুক এবং যার খোলনলচের ভিতরে থাকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হাতীমারা বুলেট। কিন্তু দলবল নিয়ে তার সাহায্যেও হাতী মারতে গিয়ে কতবার কত লোককে যে মরণদশায় পড়তে হয়েছে গুনে তা বলা যায় না।

মেয়ে-সেপাইরা তেমন বন্দুক চোখেও দেখেনি, এবং সেই বিশ-জনের প্রত্যেকেরই হাতে যে বন্দুক—অর্থাৎ খেলো বন্দুক ছিল, তাও নয়: অনেকের হাতে ছিল খালি সেকেলে তীর-ধনুক ও বল্লম-তরবারি। হাতীর পালে কত হাতী ছিল তা প্রকাশ পায়নি, তবে বিশজন মেয়ে যখন মিনিটখানেকের মধ্যে সাত-সাতটা হাতী মেরে ধরাশায়ী করতে পেরেছিল তখন হস্তিযূথ যে মস্তবড় ছিল সেটুকু বুঝতে দেরি হয় না।

কিন্তু এখানে সপ্তহস্তীবধের চেয়ে আজব কথা হচ্ছে সেই দুর্ধর্ষ বীরাঙ্গনাদের প্রচণ্ড সাহসের কথা। এমন কাহিনী আর কোনদিন শোনা যায়নি।

ডাহোমির রাজা বিপুল বিস্ময়ে বীরাঙ্গনাদের সাদর অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, "আজ থেকে তোমাদের উপাধি হবে 'মাতঙ্গমর্দিনী'।"

তারপর সেই বিশজন মাতঙ্গমর্দিনী নিয়ে গড়া দলে ভর্তি করা হতে লাগল নারী-বাহিনীর সেরা সেরা বীরাঙ্গনাকে। যুদ্ধের সময়ে খুব ভেবেচিন্তে কখনো-সখনো ব্যবহার করা হ'ত সেই রায়বাঘিনীর দলকে,—কারণ তাদের প্রাণকে মনে করা হ'ত মহামূল্যবান।

কিন্তু তাদের উপরেও নারী-বাহিনীর আর একটা দল ছিল। কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে দক্ষ মেয়ে-সেপাইদের নিয়ে সেই দল গঠিত হ'ত। তাদের প্রত্যেকের আকার হ'ত বলিষ্ঠ ও লম্বাচওড়া এবং কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাদের প্রধান অস্ত্র বেওনেট বা কিরিচ। তাদের পরনে থাকত নীল ও সাদা রঙের জমির ডোরাকাটা আর হাতকাটা জামা এবং হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে-পড়া ঘাগরা।

ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় দলের অর্থাৎ কিরিচধারিণী ও মাতঙ্গমর্দিনী-দের পরেও মেয়ে-ফৌজে ছিল আরো দুই দলের পদাতি সেপাই।

এক, বন্দুকধারিণীর দল। এদের গড়নপিটন পাতলা ও দেহ ছিপ্-ছিপে। খণ্ডযুদ্ধের সময়ে যখন এই দলকে লেলিয়ে দেওয়া হ'ত, তখন দলের অনেকেই মারা পড়লেও কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাতো না।

আর এক, ধনুকধারিণীর দল। এই দলের মেয়েরা ছিল ফৌজের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়সী ও দেখতে রূপসী। হাতাহাতি লড়বার জন্যে তারা ছোরা সঙ্গে রাখত।

এই শেষোক্ত দুই দলের সৈনিকরা অন্যান্য জামা-কাপড়ের বদলে কোমরে পরত কেবল কৌপীন এবং অন্যান্য অলংকারের বদলে বাম হাতে রাখত খালি হাতীর দাঁতের বালা।

আড়াই শত বৎসরের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে মেয়ে-সেপাইরা রণকৌশলের হাড়হদ্দ বিশেষ ভাবেই রপ্ত ক'রে ফেলেছিল। তাদের প্রধান একটি ফিকির ছিল, অতর্কিতে শত্রুদের আক্রমণ।

মেয়ে-ফৌজে সৈন্যসংখ্যা ছিল আট হাজার এবং এই নারী-বাহিনীর পরিচালিকা ছিল, নান্সিকা।

কবি মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় নান্সিকা হচ্ছে—

"বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা!"

হ্যাঁ, যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অপূর্ব তার গুণপনা, তেমনি ভয়াল তার বীরপনা। প্রকাশ, তার সঙ্গে হাতাহাতি সংঘর্ষে প্রাণদান করতে হয়েছে পাঁচশত শত্রু-যোদ্ধাকে! অমোঘ তার অস্ত্রধারণের শক্তি এবং অভ্রান্ত তার সৈন্যচালনার দক্ষতা!

যে পুরুষ-কবি সর্বপ্রথমে নারীকে অবলা বলে বর্ণনা করেছিলেন, নান্সিকাকে স্বচক্ষে দেখলে তিনি সভয়ে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হতেন। প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গে নান্সিকার দেহতটে যখন উচ্ছ্বসিত হতে থাকত বলিষ্ঠ যৌবনের ভরাট জোয়ার, তখন তার দুই চক্ষে ঠিকরে উঠে বীর্যবত্তার তীব্র বিদ্যুৎ শত্রুর চিত্তে জাগিয়ে তুলত আসন্ন অশনি-পাতের আশঙ্কা!

এই নান্সিকার সঙ্গে য়ুরোপ থেকে আগত ফরাসী দস্যুদের ভীষণ শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

কারণটা খুলে বলা দরকার।

বরাবরই দেখা গিয়েছে য়ুরোপীয় দস্যুরা প্রথমে সওদাগরের বা পরিব্রাজকের বা ধর্মপ্রচারকের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে এসিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে গিয়ে অতি নিরীহের মত ধরনা দিয়েছে, তার-পর সময় বুঝে ধীরে ধীরে নানা অছিলায় গোপনে শক্তিসঞ্চয় ক'রে হঠাৎ একদিন নিজমূর্তি ধরে রক্তধারায় মাটি ভাসিয়ে এবং দিকে দিকে মৃত্যু ছড়িয়ে সর্বগ্রাস ক'রে বসেছে।

শ্বেতাঙ্গরা এই ভাবে ভারতবর্ষে এসে শিকড় গেড়ে বসেছিল।

আফ্রিকাতেও তারা গোড়ার দিকে সেই চালই চালে এবং অন্ধিসন্ধি বুঝে নেয়। কিন্তু ভারতের তুলনায় আফ্রিকা ছিল প্রায় অরক্ষিত, কারণ আগ্নেয়াস্ত্রকে কতক্ষণ ও কতটুকু বাধা দিতে পারে তরবারি, বল্লম ও তীরধনু? দেখতে দেখতে নানাদেশী শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকার উপরে ক্ষুধিত রাক্ষসের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার নানা অংশ ছিনিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে নিলে।

পশ্চিম আফ্রিকার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফরাসী দস্যুরা। ছলে-বলে-কৌশলে অনেকখানি জায়গা দখল ক'রে নিয়ে অবশেষে তাদের শনির দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ডাহোমির উপরে।

ডাহোমি তখনও স্বাধীন। তার সিংহাসনে আসীন রাজা গেলেল!

বেয়ল হচ্ছেন ফরাসীদের এক পদস্থ কর্মচারী। একদিন তিনি এলেন রাজা গেলেলের কাছে—মুখে তাঁর শান্তিদূতের মুখোশ।

রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন হাসিমুখে। বলা বাহুল্য, বেয়লের মুখে মিষ্ট মিষ্ট বুলির অভাব হ'ল না। সরল রাজা ভুলে গেলেন কথার ছলে।

নান্সিকা ছিল নারী-বাহিনীর অন্যতম পরিচালিকা। অতিশয় বুদ্ধিমতী বলে তার সুনাম ছিল যথেষ্ট। সে ছ্যাখনহাসি বেয়লের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হ'ল না—ফন্দিবাজ ফরাসীদের স্বরূপ চিনে ফেলেছিল তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বেয়লের ফন্দি ব্যর্থ করবার জন্যে নান্সিকা নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু সে কিছুই করতে পারলে না—ক্রমে ক্রমে রাজা হয়ে পড়লেন বেয়লের হাতের কলের পুতুলের মত। বেয়ল যা বলেন, রাজা তাইতেই সায় দেন।

নান্সিকা তখন দেশের শত্রুকে বধ করবার জন্যে গোপনে চক্রান্তে প্রবৃত্ত হ'ল।

খবরটা রাজার কানে উঠল। খাপ্পা হয়ে বললেন, "আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত! বন্দী কর নান্সিকাকে! লাগাও পিঠে সপাসপ্ কোড়ার বাড়ি! বেয়ল যতদিন আমার রাজধানীতে থাকবেন, ততদিন তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিও না।"

তাই হ'ল। বেত্রদণ্ডের পরে নান্সিকা হ'ল বন্দিনী।

তারপরেই কিন্তু-নান্সিকা রাজার মনে যে সন্দেহের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল, ক্রমে তা হ'ল নির্জলা সত্যে পরিণত। একটু একটু করে রাজার চোখ ফুটতে লাগল বটে, কিন্তু তিনি কোন-কিছু করবার আগেই নিজের কাজ ফতে ক'রে বেয়ল বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন।

নান্সিকা আবার কারাগারের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

তারপর কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একদিন হৃৎপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে রাজা পড়লেন মৃত্যুমুখে।

প্রজারা হাহাকার করতে লাগল—হায়, হায়, এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

নান্সিকা সুযোগ বুঝে দিকে দিকে রটিয়ে দিলে—"এ হচ্ছে দেশের শত্রু ফরাসীদের কারসাজি! এমন ভাবে মানুষ মারা পড়ে না। দুষ্ট বেয়লের বশীকরণ-মন্ত্রে বশ হয়েই রাজা মারা পড়েছেন—কুহকী ফরাসীদের দেশ থেকে এখনি তাড়াও!"

অরণ্যরাজ্য ডাহোমির নিরক্ষর সব প্রজা—রাজনীতি, কূটনীতি প্রভৃতি অতশত কিছুই বোঝে না, নান্সিকার কথাই তারা ধ্রুবসত্য ব'লে মেনে নিলে। ফরাসীদের উপরে সকলে খড়্গাহস্ত হয়ে উঠল।

নূতন রাজা হয়ে ডাহোমির সিংহাসনে বসলেন বেহান্‌জিন্।

নান্সিকা ছিল তাঁর প্রিয়পাত্রী। তিনি বললেন, "নান্সিকা! আজ থেকে তুমি হলে আমার সমস্ত নারী-বাহিনীর অধিনায়িকা। যাও, শত্রুজয় ক'রে ফিরে এস।"

চার

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

কোটোনৌ হচ্ছে ফরাসীদের দ্বারা অধিকৃত একটি দুর্গ-নগর। সেই নগরে থানা দিয়ে বসেছেন ডাহোমির শাসনকর্তারূপে নির্বাচিত জিন বেয়ল।

ডাহোমির নূতন অধিপতি বেহান্জিন্ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "আমাদের স্বর্গীয় রাজাকে—আমার পূর্বপুরুষকে ফরাসী কুক্কুর বেয়ল কুহকমন্ত্রে বধ করেছে! প্রতিশোধ, প্রতিশোধ—আমি প্রতিশোধ চাই!"

রায়ে রায় দিয়ে নান্সিকা তীব্রস্বরে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে গেলে প্রথমেই করতে হবে বেয়লের মুণ্ডপাত! তারপর আমাদের স্বদেশ থেকে দূর ক'রে খেদিয়ে দিতে হবে ফরাসী দস্যুদের!"

রাজা বললেন, "উত্তম! যা ভালো বোঝো তাই কর। তোমার সুবুদ্ধির উপরে আমার বিশ্বাস আছে।"

হাতজোড় ক'রে নান্সিকা বললে, "প্রভু, যদি আমার উপরে ভূতপূর্ব মহারাজের এই বিশ্বাস থাকত, তাহ'লে ব্যাপারটা আজ এতদূর পর্যন্ত গড়াত না।"

রাজা বললেন, "ও কথা এখন যেতে দাও নান্সিকা। অতীতের ভুল আর শোধরাবার উপায় নেই। বর্তমান সমস্যার সমাধান কর। তোমার অধীনে তো নারী-সেনাদল প্রস্তুত হয়ে আছে—'মাতঙ্গিনী-যূথ যথা মত্ত মধু-কালে'। সেই আহোসিদের নিয়ে বেরিয়ে পড় গৌরবপূর্ণ জয়যাত্রায়!"

নান্সিকা বললে, "যথা আজ্ঞা মহারাজ। এই আমি আপনার আদেশ পালন করতে চললুম!"

সেই অসিকার্মুকধারিণী বলিষ্ঠযৌবনা বীরাঙ্গনা বীরদর্পে পৃথিবীর উপরে সজোরে পদক্ষেপ করতে করতে মনে মনে বললে, "কেবল দেশের জন্যে নয় মহারাজ, কেবল আপনার জন্যেও নয়—সেই সঙ্গে নিজের জন্যেও আজ আমি প্রতিহিংসাব্রত উদ্‌যাপন করতে যাব! সেদিনকার অপমান কি আমি জীবনে ভুলতে পারব? আমি ডাহোমির সেনানায়িকা নান্সিকা, সকলের সামনে আমার হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি আর পিঠে কোড়ার বাড়ির পর কোড়ার বাড়ি! শয়তান বেয়ল আর দেশের শত্রু ফরাসী দস্যুরা, ওরাই দায়ী এর জন্যে! ওদের যমালয়ে পাঠাতে না পারলে জীবন থাকতে আমার শান্তি নেই।"

ডিমি-ডিমি-ডিমি-ডিমি বাজতে লাগল কাড়া-নাকাড়া, আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে উড়তে লাগল বর্ণরঞ্জিত পতাকার পর পতাকা, দিকে দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল নাগরিকদের হুংকৃত কণ্ঠের ঘন ঘন জয়োল্লাস এবং নারী-সেনাদের তালে তালে দর্পিত পাদপ্রহারে থর-থর-কম্পিত পৃথিবী যেন আর্তনাদ করতে লাগল সশব্দে।

ফৌজের পুরোভাগে থেকে মাথার উপরে শূন্যে শাণিত বিদ্যুৎ-

চিকন তরবারি আস্ফালন করতে করতে নান্সিকা উচ্চ, দৃপ্ত স্বরে বার বার ব'লে চলল—"আগে চল্, আগে চল্, আগে চল্! শত্রুসংহার করতে হবে, শত্রুসংহার! তোমার শত্রু, আমার শত্রু, রাজার শত্রু, দেশের শত্রু! হয় মারব, নয় মরব, হার স্বীকার করব না! আগে চল্, শত্রুসংহার কর—মার্ আর মর্!"

লামা জলাভূমি—হঠাৎ দেখলে মনে হয় দূরবিস্তৃত বিশাল হ্রদ, বুকে তার নীলিমা মাখিয়ে দেয় আকাশের প্রতিচ্ছায়া!

তারই পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে নান্সিকার রক্তলোচনা বিভীষণা সঙ্গিনীরা বন্দী ক'রে আনলে একদল ফরাসীকে।

রাজা বেহান্‌জিনের উৎসাহের সীমা রইল না। লামা হ্রদের তটে দাঁড়িয়েই তিনি প্রকাশ্যভাবে পররাজ্যলোভী ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেন।

য়ুরোপে যখন এই খবর গিয়ে পৌঁছলো তখন সকলের ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল ব্যঙ্গহাসির রেখা। কোথায় কোটি কোটি মানুষের বৃহৎ বাসভূমি, সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় ও শক্তিসামর্থ্যের জন্যে সুপ্রসিদ্ধ ফ্রান্স, আর কোথায় অসভ্য কৃষ্ণাঙ্গের জন্মভূমি আফ্রিকার অজানা এক প্রান্তে অবস্থিত মাত্র দশ লক্ষ প্রায়নগ্ন-বর্বর মনুষ্যের বন্য স্বদেশ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ডাহোমি! পর্বতের পদতলে নগণ্য নুড়ি, মত্তহস্তীর চলনপথে তুচ্ছ উই, বনস্পতির ছায়ার তলায় ক্ষুদ্র তৃণ! অ্যাঁ! হাউই বলে কিনা—'তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই!' শ্বেতাঙ্গ সেনাপতির একটিমাত্র ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ সৈনিক ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে কেবল পায়ের বুটজুতোর চাপেই ডাহোমিকে এখনি সমতল পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আসতে পারে!

সুতরাং ফ্রান্সের টনক নড়ল না।

কিন্তু নান্সিকার যুক্তি হচ্ছে, ছোট্ট বিছাকে ঘাঁটালে সেও পাগলা হাতীকে কামড়ে দিতে ইতস্ততঃ করে না এবং ধুম্‌সো হাতী তখন বিষের জ্বালায় ছটফটিয়ে দৌড় মারতে বাধ্য হয়! অতএব—আগে চল্‌, আগে চল্‌! হয় শত্রুবধ, নয় মৃত্যু! অতএব—থামল না ডিমি-ডিমি দামামা-ধ্বনি, আনত হ'ল না দর্পিত ধ্বজপতাকা, স্তব্ধ হ'ল না ক্ষুদ্র ডাহোমির রুদ্র জয়নাদ!

শূন্যে ঝকঝকে তরবারি তুলে, মাথার উপরে শাণিত বল্লম উঁচিয়ে শরাসনে তীক্ষ্মমুখ বাণযোজন ক'রে সেই মূর্তিমতী চামুণ্ডাবাহিনী বনে বনে খুঁজে বেড়াতে লাগল কোথায় আত্মগোপন ক'রে আছে ফরাসী দস্যুদল!

বনে-মাঠে যখন-তখন যেখানে-সেখানে খণ্ডযুদ্ধের পর খণ্ডযুদ্ধ! ফরাসী পুরুষপুঙ্গবরা অবলা নারীদের দেখে প্রথমে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় না, কিন্তু তারপরেই মারাত্মক অস্ত্রাঘাতে এক-মুহূর্তের অবহেলার ফলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে!

তারপর ডেন্‌হাম হ্রদের ধারে সাদায়-কালোয়—সাদা-চামড়া পুরুষ এবং কালো-চামড়া মেয়ের—মধ্যে হাতাহাতি হানাহানি হ'ল বার বার! বন্দুকগর্জন, কোদণ্ডটংকার, তরবারির ঝন্‌ঝনানি, নরনারীর মিলিত কণ্ঠের ভৈরব তর্জন, আহতদের করুণ কাতরানি এবং মরণোন্মুখের অন্তিম চীৎকার কান্তার-প্রান্তর ও আকাশ-বাতাসকে যেন সচকিত করে তুললে!

ফরাসীদের সেনাধ্যক্ষরা স্তম্ভিত। গ্রীক পুরাণ-কাহিনীতে তাঁরা পড়েছেন কি শুনেছেন যে, স্মরণাতীত কাল পূর্বে কোন্ এক সময়ে নাকি রণরঙ্গিণী নারী-বাহিনীর সঙ্গে গ্রীক বীরপুরুষদের তুমুল সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং গ্রীসের পার্থেনন দেবমন্দিরের শিলাপটের

উপরে সেই পৌরাণিক যুদ্ধে নিযুক্ত নর-নারীর উৎকীর্ণ মূর্তিচিত্র অনেকে স্বচক্ষে দর্শনও করেছেন।

সে তো কবির কাল্পনিক কাহিনী মাত্র, আর সেই রণরঙ্গিণী নারীরাও শ্বেতাঙ্গিনী!

কিন্তু এই আসন্ন বিংশ শতাব্দীর মুখে বর্বর আফ্রিকায়,—যেখানে কালো কালো ভূতের মত পুরুষগুলো শ্বেতাঙ্গদের দূরে দেখলেও ভেড়ার পালের মত ভয়ে ছুটে পালায় কিংবা কাছে এলে গোলামের মত জুতোর তলায় লুটিয়ে পড়ে, সেখানকার অর্ধোলঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গিনীরা কিনা শ্বেতপুরুষের মুণ্ডচ্ছেদ করবার জন্যে দূর থেকে হুংকার তুলে খাঁড়া নিয়ে ধেয়ে আসে!

এই কল্পনাতীত দৃশ্যের কথা ভেবে শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধারা বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁদের চাঙ্গা ক'রে তুলে অদূরে জাগে শত শত কামিনীকণ্ঠে খলখল অট্টহাস্যরোল এবং তারও উপরে গলা তুলে উদ্দীপিত স্বরে সচীৎকারে কে বলে ওঠে—"আগে চল্, আগে চল্! শত্রু মার্, শত্রু মার্!" তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে জঙ্গলের অন্তরাল থেকে সহসা বেরিয়ে হন্নে হয়ে অস্ত্র আস্ফালন করতে করতে ছুটে আসে সারি সারি বীরনারীর দল। পর মূহূর্তেই ধুন্ধুমার, হুহুংকার, ধনুষ্টংকার ও তরবারির ঝনৎকার!

কুসুমকোমলা বলে কথিত রমণীদের এমন সংহার-মূর্তি ফরাসীরা আর কখনো দেখেনি!

কিন্তু ফরাসীরা মার খেয়ে মার হজম করতে বাধ্য হ'ল তখনকার মত।

সেই দুর্দমনীয় নারী-বাহিনী পিছু হটতে জানে না, বীরবিক্রমে এগিয়ে আসে আর এগিয়ে আসে!

বীরাঙ্গনারা মারতে মারতে ছুটে চলে, মরতে মরতে মারণ-অস্ত্র চালায়। মৃত্যুভয় ভুলে যারা রক্তস্নান করে এবং হাসতে হাসতে প্রাণ-কাড়াকাড়ি খেলায় মাতে, কে লড়াই করবে তাদের সঙ্গে ?

এই অদ্ভুত সংবাদ সাগর পার হয়ে পৌঁছলো গিয়ে ফ্রান্সের বড় কর্তার কাছে। তাঁরাও প্রথমটা হতবাক হয়ে গেলেন মহাবিস্ময়ে !

সকলে দারুণ মর্মপীড়ায় কাহিল হয়ে পড়লেন। একদল অরণ্য-চারিণী নগণ্য কৃষ্ণাঙ্গীর প্রতাপে কীর্তিমান ফ্রান্সের শ্বেত পুরুষত্ব নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে, এ কথা শুনলে য়ুরোপের অন্যান্য দেশ টিটকারী দিতে ও হাসাহাসি করতে বাকি রাখবে না !

অবিলম্বে এর একটা বিহিত করা চাই।

উপরওয়ালাদের হুকুমে তখনি তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। তার কয়েক মাস পরে যথাসময়ে ডাহোমির দিকে পাঠানো হ'ল দলে দলে নতুন সৈন্য, বড় বড় কামান এবং ভারে ভারে রসদ।

প্রধান সেনাপতি হয়ে গেলেন জেনারেল সিবাস্টিয়ান টেরিলন। তিনি আড্ডা গেড়ে বসলেন দুর্গ-নগরী কোটোনৌয়ের উপকণ্ঠে।

পাঁচ

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। দুর্গ-নগরী কোটোনৌ।

তার চতুর্দিকে ধূ-ধূ-ধূ তেপান্তর। এবং তেপান্তরের পর দুরধিগম্য কান্তার—বাহির থেকে তার ভিতরে প্রবেশ করা এবং ভিতর থেকে তার বাহিরে বেরিয়ে আসা দুইই সমান কষ্টসাধ্য।

কিন্তু বনচর জীবরা বনের গোপন পথ জানে। রণরঙ্গিণী রমণীরা

হচ্ছে বনরাজ্যের অন্তঃপুরচারিণী—অবহেলায় এড়িয়ে চলতে জানে যে কোন আরণ্য বাধাবন্ধ।

দুর্গের অদূরেই মাঠের উপরে পড়েছে সৈনিকদের ছাউনি। সেখানে এক তাঁবুর ভিতরে বসে ফরাসীদের দ্বারা প্রেরিত শাসনকর্তা আমাদের পূর্বপরিচিত বেয়ল, জেনারেল টেরিলন ও আরো দুইজন পদস্থ সেনানী মদ্যপান করতে করতে আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন।

টেরিলনের চেহারা যেন তালপাতার সেপাই! মেজাজ তাঁর এমনি কঠিন যে ভাঙলেও মচকাতে চায় না। ফৌজের সৈনিকদের কাছে তিনি ছিলেন চোখের বালির মত দুঃসহ। তিনি তাচ্ছিল্য-ভরা কণ্ঠে বলছিলেন, "আরে ছোঃ! অস্ত্র ধরলে কি হবে, ওরা তো স্ত্রীলোক—তুচ্ছ স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছুই নয়!"

বেয়ল নারী-যোদ্ধাদের কেরামত হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন,—বললেন, "কিন্তু তারা বিভীষণা, সাংঘাতিক!"

—"তাহ'লে আমার সঙ্গে আরো দ্বিগুণ সৈন্য পাঠানো হ'ল না কেন?"

এইবার আলোচনায় যোগ দিলেন কাপ্তেন আউডার্ড, এতক্ষণ তিনি একমনে বসে বসে চুমুকের পর চুমুকে খালি করছিলেন মদের গেলাসের পর গেলাস। অধার্মিক ও কর্কশ প্রকৃতির লোক। খুনোখুনির সুযোগ পেলেই খুশি! লম্বাচওড়া রোমশ দৈত্যের মত চেহারা। তিনি বড়াই ক'রে বললেন, "জেনারেল, কি হবে আরো সৈন্যে? স্ত্রীলোকগুলোকে শিক্ষা দেবার জন্যে আমি প্রস্তুত! আর যাইই হোক্, পুরুষের মত তারাও তো মরতে বাধ্য?"

চেয়ারের পিছনদিকে হেলে প'ড়ে বেয়ল ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে উঠলেন। বললেন, "আউডার্ড, তুমি সাহসী বটে। কিন্তু তুমি

তো কখনো রায়বাঘিনীদের সঙ্গে লড়াই করনি! দেখো, কালই তুমি তাদের হাতে পঞ্চত্বলাভ করবে। জেনারেল, তোমাকেও তারা মারবে। আর মুসেট, তুমিও বাঁচবে না!"

শেষোক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন লেফটেনাণ্ট চার্ল্‌স্ মুসেট। তিনি হাঁ, না কিছুই না বলে ব্রাণ্ডির গেলাসে চুমুক দিতে লাগলেন মৌনমুখে। বোধ হয় এসব কথা তাঁর মনে হচ্ছিল বাজে বক্‌বকানি!

নিজের শেষ গেলাসটা খালি ক'রে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল! তারপর টলতে টলতে তাঁবুর এককোণে গিয়ে বিছানার উপরে ধপাস্ ক'রে লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে বললেন, "এখন থো কর এ-সব কথা। রাত হয়েছে, আমি শ্রান্ত।"

কিন্তু বেয়লের মুখে বন্ধ হ'ল না কথার তোড়। তিনি বললেন, "ঘুমনো হচ্ছে বোকামি। আহোসিরা আক্রমণ করবে দুপুর রাত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যেই।"

আউডার্ড ব্যঙ্গভরে বললে, "কিন্তু তাদের আদর করবার জন্যে আমরা তো তৈরি হয়েই আছি! কি বল হে মুসেট, তাই কিনা?" বলেই তাঁকে এক গুঁতো মারলেন।

কিন্তু গুঁতো খেয়েও মুসেটের রা ফুটল না। নেশাটা বোধ করি বড়ই জমে উঠেছিল!

উত্তেজিত কণ্ঠে ক্ষিপ্তের মত বেয়ল বললেন, "শোনো, শোনো, তোমরা বুঝতে পারছ না কেন? রায়বাঘিনীরা দিনের খট্‌খটে আলোয় লড়াই করে না। সূর্যোদয়ের পূর্ব-মুহূর্তেই তারা করে আক্রমণ!"

কেবা শোনে কার কথা। "নির্বোধ! মূর্খ!" বলে বেয়ল হতাশ হয়ে গজরাতে গজরাতে ফিরে গেলেন নিজের তাঁবুতে।

কিন্তু তখনো পর্যন্ত তিনিও জানতেন না যে, ডাহোমির রাজা বেহান্‌জিন সেই দিনই—অর্থাৎ মার্চ মাসের চার তারিখেই—ফরাসীদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধের পর কোটোনৌ দুর্গ-নগরী অধিকার বা অবরোধ করবার আদেশ দিয়েছেন!

ছয়

নিজের বস্ত্রাবাসে প্রবেশ ক'রে বেয়ল ক্রুদ্ধস্বরে আবার বললেন, "নির্বোধ মূর্খের দল!"

খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ ক'রেও ঘুম এল না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, রাত সাড়ে চারটা।

শয্যায় উঠে বসে নিজের দুটো রিভলভারের কলকব্জা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখলেন! চোখ তুলে লক্ষ্য করলেন দেওয়ালে যথাস্থানেই ঝুলছে শক্তিশালী বন্দুকটা—আট-আটটা টোটায় ভরা।

নিজের মনে-মনেই বললেন, "হয়তো আউডার্ডের মত ভ্রান্ত নয়।—প্রস্তুত হয়ে থাকো, আহোসিদের কাছে আসতে দাও, তারপর বন্দুক ছুঁড়ে ভূমিসাৎ কর! একমাত্র আশার কথা এই যে বেশীর ভাগ রায়বাঘিনীর হাতেই বন্দুক নেই। ধনুক, বর্শা, তরবারি,—বন্দুকের সামনে ও-সব তো খোকাখুকীর খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়! তবে মুশকিলের কথাও আছে! রায়বাঘিনীরা দলে ভারী!"

গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুড়ুম্ গুড়ুম্! আচম্বিতে বন্দুকের পর বন্দুকের গর্জন!

একলাফে শয্যা ছেড়ে বেয়ল বলে উঠলেন, "তারা আসছে, তারা আসছে, তারা আসছে!"

তাড়াতাড়ি পটমণ্ডপের বাইরে বেরিয়ে প'ড়ে বেয়ল মুখ তুলে দেখলেন, পূর্ব-নাট্যশালায় মহিমময়ী উষার শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র আলোর পাপড়ি ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে।

বেয়ল বললেন, "জানি, আমি জানি! এই তো আহোসিদের আক্রমণের মাহেন্দ্রক্ষণ!"

বন্দুকের গুড়ুম্-গুড়ুম্ শব্দে জেনারেল টেরিলনেরও ঘুম ভেঙে গেল সচমকে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে একটা বাঁশিতে জোরে ফুঁ দিয়ে করলেন উচ্চ সংকেতধ্বনি!

তৎক্ষণাৎ কোথা থেকে বেজে উঠল রণতূর্য। সঙ্গে সঙ্গে কামান-গুলোর মুখে মুখে জাগল আরক্ত আলোকচমক ও গুরু গুরু বাজের ধমক। আউডার্ড ও মুসেট ছুটে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন—অন্যান্য সৈনিকরাও শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দখল করলে নিজের নিজের জায়গা।

খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে ক্রুদ্ধস্বরে টেরিলন বলে উঠলেন, "পাজী জানোয়ারের দল! আমাকে জুতো পরবারও সময় দিলে না!"

অধিকাংশ রণরঙ্গিনীরই সম্বল বল্লম ও তীরধনু বটে, তবে অনেকের হাতে বন্দুকও ছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে বাণের সঙ্গে গরমাগরম বুলেটও ছুটোছুটি করতে লাগল ঘৃণিত য়ুরোপীয়দের শ্বেত অঙ্গ ছিদ্রময় করবার জন্যে।

কাটা গাছের গুঁড়ি ও বালিভরা থলের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে বেয়লও বন্দুক তুলে বুলেট-বৃষ্টি করতে লাগলেন।

এক জায়গায় সুযোগ পেয়ে একদল রায়বাঘিনী ফরাসী ফৌজের মাঝখানে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করলে, ফরাসীদের প্রচণ্ড অগ্নি-বৃষ্টিকে তারা একটুও আমলে আনলে না।

ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠল। বার্তাবহ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে নতুন বিপদের খবর জানালে।

টেরিলন চীৎকার ক'রে বললেন, "হা ভগবান! আহোসিরা আমাদের একটা কামান কেড়ে নিয়েছে! আমাদের একজন সৈনিকেরও মাথা কাটা গিয়েছে!"

বেয়ল বললেন, "নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিল। যেমন কর্ম তেমনি ফল!"

তেড়ে এল একঝাঁক চোখা চোখা বাণ, চটপট সেখান থেকে চম্পট দিলেন টেরিলন। বেয়ল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন।

রায়বাঘিনীদের আর একটা দল ধেয়ে এল—ফরাসীদের কামানগুলো করলে প্রচণ্ড অগ্নিবৃষ্টি।

হতাহত হয়ে একটা দল ভেঙে যায়—কিন্তু তুরন্ত তেড়ে আসে নতুন আর একটা দলের শত শত বীরাঙ্গনা। তাদের মরণভয় নেই—তারা মরতে মরতেও মারতে চাইবে!

দৌড়োতে দৌড়োতে মুসেট ডাকলেন, "গভর্নর বেয়ল! গভর্নর—" কথা আর শেষ হ'ল না—শোনা গেল ধনুকের টংকার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে তরুণ মুসেটের দেহ পপাত ধরণীতলে! একটা বাণ তাঁর কণ্ঠে এবং আর একটা বাণ বিদ্ধ হয়েছে তাঁর চক্ষে!

জন ছয় নারী-যোদ্ধা খন্‌খনে গলায় চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বল্লম উঁচিয়ে ফরাসী ব্যূহের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরিয়ার মত।

বেয়ল বন্দুকের কুঁদোর চোটে একজনের মাথা চুরমার ক'রে দিলেন, গুলি ক'রে মেরে ফেললেন আর একজনকে এবং তৃতীয় তরুণীকে ধরাশায়ী করলেন বেওনেটের খোঁচায়। চতুর্থ ও পঞ্চম জন মারা পড়ল অন্যান্য সৈনিকের কবলে। ষষ্ঠজনও পালিয়ে যেতে যেতে মরণাহত হ'য়ে মাটির উপরে আছড়ে পড়ল।

আপাতত এই পর্যন্ত।

বেহান্‌জিনের দ্বারা প্রেরিত প্রথম দলের আক্রমণ ব্যর্থ।

বেয়ল বললেন, "হে ভগবান, আবার যদি আক্রমণ হয় তাহ'লে আমাদের আর রক্ষা নেই!" মাথার ঘাম মুছতে মুছতে ভীরু চোখ বুলোতে লাগলেন এদিকে ওদিকে। শিবিরের উপরে বারুদের ধোঁয়া জমে আছে মেঘের মত।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বেয়ল চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মাঠ ছেয়ে আছে নারী-সৈনিকদের শতশত আড়ষ্ট মৃতদেহে। ফরাসী সৈনিকদের দেহও দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে। সেই মর্মন্তুদ রক্তরঞ্জিত দৃশ্যের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তিনি মনে মনে বললেন,—আহোসিরা যে খেলাঘরের সেপাই নয়, আশা করি টেরিলন এতক্ষণে তা দস্তুরমত সমঝে নিয়েছে!

হ্যাঁ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। যে কামানটা আহোসিরা কেড়ে নিয়েছিল, সেটা আবার দখল করবার জন্যে টেরিলন পাঠিয়েছিলেন চল্লিশজন ফরাসী সৈনিক। কামানটা পুনরধিকার ক'রে তারা ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু পিছনে মাঠের উপরে রেখে এসেছে আঠারো জন সঙ্গীর মৃতদেহ।

টেরিলন ও আউডার্ড এতক্ষণ পরে বেয়লের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বেয়ল বললেন, "এইবারে সমগ্র নারী-বাহিনী আমাদের আক্রমণ করতে আসবে। এই দ্বিতীয় আক্রমণ ঠেকাতে না পারলেই সর্বনাশ!"

টেরিলন বললেন, "আমাদের কামানগুলো প্রস্তুত হয়েই আছে। দ্বিতীয় দলের সৈন্যসংখ্যা কত হতে পারে?"
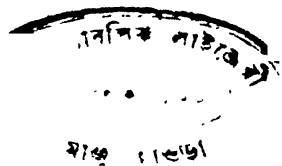
—"অন্তত তিন হাজার।"

—"কিন্তু কামানের বিরুদ্ধে ধনুকের তীর কি করতে পারে?"

বেয়ল বললেন, "ও প্রশ্নের উত্তরে মুসেট কি বলে শোনো না!"

টেরিলন বললেন, "মুসেটের মৃত্যু নিয়ে কি তুমি কৌতুক করতে চাও?"

বেয়ল জবাব দেবার সময় পেলেন না। কারণ দূর থেকে রক্ষীর উচ্চকণ্ঠে ভয়াল ধ্বনি জাগল—"আহোসিরা আসছে! আহোসিরা আসছে!"

সাত

বেয়ল বললেন, "এবারে ওরা সহজে ছাড়বে না, মরণ-কামড় দেবার চেষ্টা করবে!"

আবার শুরু হয়ে গেল কামান-বন্দুকের বজ্র-হুংকার! কিন্তু নারী-ফৌজের অগ্রগতি বন্ধ হ'ল না—সারির পর সারি বন্যা-তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল ফরাসী-ব্যূহের উপরে। ফরাসীদের অগ্নিবৃষ্টির তোড়ে হতাহত শত্রুরা যেখানে সেখানে পঙ্‌ক্তির মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে, সেখানেই নূতন নূতন রণরঙ্গিণী আবির্ভূত হয়ে ফাঁক ভরিয়ে তোলে। নিক্ষিপ্ত বল্লম ও তীরের আঘাতেও ফরাসী সৈনিকরা রক্তাক্ত পৃথিবীর উপরে লুটিয়ে পড়ে। শত শত সঙ্গিনীর মৃত্যুও আহোসিদের সেই ভয়াবহ অগ্রগতি রুদ্ধ করতে পারলে না—তাদের কাছে মৃত্যু যেন ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়! যত লোক মরে, তত যেন বাড়ে বীরবালাদের মরণানন্দ!

বেয়ল হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ওরা উন্মাদিনী, ওরা হার মানতে জানে না।"

আচম্বিতে জেনারেল টেরিলন মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়লেন, তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ হয়েছে তাঁর উরুদেশ। একহাতে বাণটাকে ক্ষতস্থান থেকে টেনে বার করতে করতে নিজের ধূমায়িত রিভলভার তুলে তিনি সমানে গুলি চালাতে লাগলেন।

সামনেকার অংশের খানিকটা বিচ্ছিন্ন করতে পেরে বীরাঙ্গনারা ব্যূহের গভীরতম অংশে ঢুকে পড়বার জন্যে আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে লাগল। যত আক্রমণ ব্যর্থ হয়, তত তাদের জেদ বেড়ে ওঠে —যেন হাজার জন প্রাণ দিলেও তারা আক্রমণ করতে ছাড়বে না! কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হ'ল না, ফরাসী কামানগুলো অজস্র অগ্নিময় গোলা নিক্ষেপ ক'রে তাদের ঠেকিয়ে রাখলে শেষ পর্যন্ত। অসংখ্য নারী-সৈনিকের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে উঠল রণক্ষেত্রে।

তারপর আচম্বিতে! দূর থেকে রাজা বেহান্‌জিনের রণশিঙা বেজে উঠে আজকের মত যুদ্ধে সমাপ্তিঘোষণা করলে! একমুহূর্তে, একসঙ্গে প্রত্যেক নারী-সৈনিক ফিরে দাঁড়িয়ে রণক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল দুঃস্বপ্নের মত!

রাজার আদেশ অমোঘ!

বেয়ল বললেন, "রাজার হুকুম না পেলে ওরা এখনো আমাদের ছাড়ত না।"

তীরটা উপড়ে ফেলে ক্ষতস্থানে 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধতে বাঁধতে টেরিলন বললেন, "তবু ওরা আমাদের কখনোই হারাতে পারত না।"

বেয়ল মুখে মত জাহির করলেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, উদ্ধত! নির্বুদ্ধির ঢেঁকি!

রক্তগঙ্গা বয়ে-যাওয়া মৃত্যুভীষণ রণক্ষেত্রের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করলেন। আন্দাজী হিসাবে তাঁর মনে হ'ল ওখানে প'ড়ে আছে অন্তত একহাজার বীরাঙ্গনার শবদেহ।

তিনি পা চালাতে চালাতে বললেন, "টেরিলন, খানিকটা মদ না হলে আমার আর চলবে না। আমি নিজের তাঁবুতে যাচ্ছি।"

টেরিলন বললেন, "আমিও শীঘ্রই তোমার কাছে গিয়ে বিজয়োৎসবে গিয়ে যোগদান করব।"

আট

নিজের পটগৃহে বসে বেয়ল লোকমুখে ফরাসীপক্ষের হতাহতের খবরাখবর নিলেন।

ফরাসীদের পঁচাত্তর জন সৈনিক মৃত্যুমুখে পড়েছে। আহতদের সংখ্যা আরো অনেক বেশী। মৃতদের মধ্যে ছিলেন বাক্যবাগীশ কাপ্তেন আউডার্ডও। প্রত্যাবর্তনের সময়ে বীরাঙ্গনাদের একটা অব্যর্থ বাণ এজীবনের মত তাঁর মুখর মুখ মৌন করে দিয়ে গেছে।

আচমকা তাঁবুর একটা ছায়াময় প্রান্ত থেকে গর্জিত কণ্ঠস্বরে শোনা গেল —"ওরে ফরাসী শূকর, আজ আর আমার হাত থেকে তোর নিস্তার নেই!"

সবিস্ময়ে বেয়ল কয়েক পদ পিছিয়ে গেলেন। তাঁর দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াল ক্রোধভীষণা, দীপ্তনয়না নান্সিকা স্বয়ং! ধনুকে যোজন করেছে সে এক শাণিত তীর! একান্ত অভাবিত দৃশ্য!

বেয়ল লাফ মেরে একটা রিভলভার হস্তগত করলেন, কিন্তু সেটা

ব্যবহার করবার আগেই নান্সিকার নিক্ষিপ্ত তীর এসে তাঁর স্কন্ধদেশ বিদীর্ণ করলে, মাটির উপরে প'ড়ে গেল রিভলভারটা।

হিংস্র জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নান্সিকা ক্ষিপ্রহস্তে চকচকে ছোরা তুলে তাঁকে আঘাত করতে গেল, কিন্তু বিদ্যুৎবেগে পাশ কাটিয়ে বেয়ল সে চোট সামলে নিয়ে একলাফে গিয়ে পড়লেন নান্সিকার উপরে—ধাক্কার চোটে তার হাত থেকে ছোরাখানা মাটির উপরে প'ড়ে গেল ঝন্-ঝন্ শব্দে। পরমুহূর্তে গৃহতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন দু'জনেই—নীচে বেয়ল, উপরে নান্সিকা।

হাঁটু দিয়ে নান্সিকা এত জোরে বেয়লের তলপেটে আঘাত করলে যে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়তে পড়তে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিলেন।

তারপর চোখের নিমেষে মাটির উপর থেকে একরাশ ধুলো তুলে নিয়ে তিনি ছুঁড়ে মারলেন নান্সিকার চোখে। মুহূর্তেকের জন্য নান্সিকা অন্ধ!

সেই অবসরে শত্রুর হাত ছাড়িয়ে বেয়ল টপ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের তরবারিখানা টেনে নিলেন, কিন্তু ততক্ষণে নান্সিকাও চকিতে আবার তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তরবারিশুদ্ধ হাত সজোরে চেপে ধরলে। এবং কি আশ্চর্য শক্তির অধিকারিণী এই বীরনারী, তার প্রবল হাতের চাপে বেয়লের শিথিল মুষ্টি থেকে খ'সে পড়ল তরবারিখানা!

নান্সিকা যেই হেঁট হয়ে তরবারি কুড়িয়ে নিতে গেল, বেয়ল দিলেন তাকে এক প্রচণ্ড ঠেলা। পরমুহূর্তেই নিজের কোমরবন্ধ থেকে বার করে ফেললেন দ্বিতীয় একটা রিভলভার।

চরম আঘাত হানবার জন্যে নান্সিকা তরবারি খুলে তেড়ে এল তীরবেগে।

বেয়লের রিভলভার গর্জন করলে একবার, তু'বার!

নান্সিকার দেহ হ'ল ভূতলশায়ী।

বাহির থেকে ফরাসী সৈনিকরা তীরবেগে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করল—সকলের পিছনে পিছনে টেরিলন।

হাঁপাতে হাঁপাতে ম্লান হাসি হেসে বেয়ল বললেন, "আজ আমি মূর্তিমতী মৃত্যুর কবলে গিয়ে পড়েছিলুম!" তারপর বিবশ হয়ে বসে পড়লেন।

অবশিষ্ট

রণাঙ্গনে বীরাঙ্গনাদের সেই-ই হচ্ছে শেষ রণরঙ্গ।

তার সাত সপ্তাহ পরে রাজা বেহান্‌জিন নারী-সেনাদের ভাঙা দল আর পুরুষ সৈনিকদের নিয়ে আর একবার বাধা দিতে অগ্রসর হন, কিন্তু শোচনীয়রূপে হেরে যান। তারপর কিছুকাল বন-বাদাড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে অবশেষে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করলেন। এবং ফৌজ ও অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে মেয়েরাও আবার অন্তঃপুরে ফিরে গিয়ে হেঁসেলে ঢুকে হাতা-খুন্তি নাড়তে লেগে গেল!

আজ কিন্তু চাকা আবার ঘুরে গিয়েছে।

আটান্ন বৎসর আগে, ডাহোমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে দেশের শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়েছিল বীরবালিকা নান্সিকা।

কিন্তু আজ আর ডাহোমি পরাধীন নয়। যুগধর্মের গতি বুঝে ফরাসীরা আজ প্রভুর উচ্চাসন ছেড়ে নেমে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। ডাহোমির বাসিন্দারা আজ স্বাধীন।

শান্তিলাভ করেছে নান্সিকার আত্মা!

বর্গী এল দেশে

'খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো,
বর্গী এল দেশে'—

আমাদের ছেলেভুলানো ছড়ার একটি পংক্তি।

মনে করুন, বাংলাদেশের শান্ত স্নিগ্ধ পল্লীগ্রাম। দুপুরবেলা, চারিদিক নিরালা। শ্যামসুন্দর পল্লীপ্রকৃতি রৌদ্রপীত আলো মেখে করছে ঝলমল ঝলমল। বাতাসে কোথা থেকে ভেসে আসছে বনকপোতের অলস কণ্ঠস্বর।

চুকে গিয়েছে গৃহস্থালীর কাজকর্ম। মাটিতে শীতলপাটি বিছিয়ে খোকাকে নিয়ে বিশ্রাম করতে এসেছেন ঘুম-ঘুম চোখে খোকার মা। কিন্তু ঘুমোবার ইচ্ছা নেই খোকাবাবুর। বিদ্রোহী হয়ে তারস্বরে তিনি জুড়ে দিলেন এমন জোর কান্না যে, ঘুম ছুটে যায় পল্লীর এ-বাড়ির ও-বাড়ির সকলের চোখে, ছিঁড়ে যায় বনকপোতের শান্তিগান, তরুলতার কলতান, সচকিত হয়ে ওঠে নির্জন পথের তন্দ্রাস্তব্ধতা।

ঘুমপাড়ানি সঙ্গীতের তালে-তালে খোকার মাথা আর গা চাপড়ে চলেন খোকার মা। সেই আদর-মাখা নরম হাতের ছোঁয়ায় খানিক পরে খোকাবাবুর চোখের পাতা জড়িয়ে এল ঘুমের ঘোরে, ধীরে ধীরে। অবশেষে মৌন হল ক্রন্দনভরা কণ্ঠস্বর।

পাড়া গেল জুড়িয়ে।

আচম্বিতে অগাধ স্তব্ধতার নিদ্রাভঙ্গ করে দিকে দিকে জেগে উঠল অত্যন্ত আতঙ্কিত জনতার গগনভেদী আর্ত চিৎকার!

পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ভীত উচ্চরব শোনা গেল—'পালাও, পালাও! এল রে ঐ বর্গী এল! সবাই পালাও, বর্গী এল!'

ধূলিপটলে দিগ্‌বিদিক্ অন্ধকার। উল্কাবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ধেয়ে আসে হাজার অশ্বারোহী—উর্ধ্বোত্থিত হস্তে তাদের শাণিত কৃপাণ, বিস্ফারিত চক্ষে নিষ্ঠুর হিংসা, কর্কশ কণ্ঠে ভৈরব হুংকার।

বর্গী এল দেশে—ঘরে ঘরে হানা দিতে, গৃহস্থের সর্বস্ব লুঠতে, গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালাতে, পথে পথে রক্তস্রোত ছোটাতে, আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ হরণ করতে।

পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে ধড়মড় করে উঠে বসল আবার ঘুমভাঙা খোকাখুকিরা। কিন্তু আর শোনা গেল না তাদের কান্না, বনকপোতের ঘুমপাড়ানি সুর এবং তরুলতার মর্মররাগিণী।

এমনি ব্যাপার হয়েছে বারংবার। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল। বাংলার মাটিতে ইংরেজরা শিকড় গাড়বার চেষ্টা করছে ছলে বলে কৌশলে।

দুই

'বর্গী' বলতে কি বোঝায়?

আভিধানিক অর্থানুসারে যার 'বর্গ' আছে সে-ই হল 'বর্গী'। 'বর্গে'র একটি অর্থ 'দল'। যারা দল বেঁধে আক্রমণ করত তাদেরই বর্গী বলে ডাকা হত।

ইতিহাসেও 'বর্গী' বলতে ঠিক ঐ কথাই বুঝায় না। 'বর্গী' নাকি 'বার্‌গীর' শব্দের অপভ্রংশ। মহারাষ্ট্রীয় ফৌজে যে-সব উচ্চশ্রেণীর সওয়ার ছিল নিজেদের ঘোড়ার ও সাজপোশাকের অধিকারী, তাদের নাম 'সিলাদার'। কিন্তু 'বারগীর' বলতে বোঝায় সবচেয়ে

নিম্নশ্রেণীর সওয়ারদের। তারা অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব লাভ করত রাজ-সরকার থেকেই।

প্রাচীনকালে অনার্য হুনজাতীয় ঘোড়সওয়াররা দলে দলে পূর্ব-য়ুরোপে এবং উত্তর-ভারতে প্রবেশ করে দিকে দিকে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ইতিহাসে ভয়াল নাম অর্জন করেছিল। বর্গীরাও সেই জাতীয় হানাদার; তবে তাদের অত্যাচার অতটা ব্যাপক হয় নি, 'বর্গীর হাঙ্গামা' হচ্ছে বিশেষভাবে বাংলাদেশেরই ব্যাপার।

সত্য কথা বললে বলতে হয়, পরবর্তীকালের বর্গীর হাঙ্গামার জন্যে এক হিসাবে দায়ী হচ্ছেন ভারতগৌরব ছত্রপতি শিবাজীই। প্রধানত লুণ্ঠনের দ্বারাই তিনি নিজের সৈন্যদল পোষণ করতেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সদলবলে লুণ্ঠনকার্য চালিয়েছেন দক্ষিণ-ভারতের নানা স্থানেই; তার ফলে কেবল মুসলমান নয়, কত সাধারণ নিরীহ হিন্দুও যে নির্যাতিত হয়েছিল, ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। তখনকার মারাঠীরাও জানত, লুণ্ঠনই হচ্ছে সৈনিকের অন্যতম কর্তব্য।

আরম্ভেই যেখানে নৈতিক আদর্শ এমন ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়, পরবর্তীকালে তা উন্নত না হয়ে অধিকতর অবনমিত হয়ে পড়বারই কথা। এক্ষেত্রেও হয়েছিল ঠিক তাই। শিবাজীর কালের মারাঠী সৈনিকদের চেয়ে বর্গীরা হয়ে উঠেছিল আরো বেশি নিষ্ঠুর, হিংস্র ও দুরাচার।

কম-বেশি এক শতাব্দীর মধ্যে মোগলদের শাসনকালে হতভাগ্য বাংলাদেশকে দু-দুবার ভোগ করতে হয়েছিল ভয়াবহ নির্যাতন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফিরিঙ্গি ও মগ বোম্বেটেদের ধারাবাহিক অত্যাচারের ফলে নদীবহুল দক্ষিণ ও পূর্ব-বাংলার কতক অংশ জন-শূন্য শ্মশানে পরিণত হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। সুন্দরবন

অঞ্চলে আগে ছিল সমৃদ্ধিশালী জনপদ, পরে তা পরিণত হয়েছিল হিংস্র জন্তুর জঙ্গলাকীর্ণ বিচরণ-ভূমিতে এবং পূর্ববঙ্গের কোন-কোন অঞ্চলে নাকি আকাশ দিয়ে পাখি পর্যন্ত উড়তে ভরসা করত না।

এমনি সব অরাজকতার জন্যে দায়ী কোন-কোন লোককে ইতিহাস মনে করে রেখেছে। যেমন পর্তুগিজদের গঞ্জেলেস ও কার্ভালহো এবং মারাঠীদের ভাস্কর পণ্ডিত। শক্তির অপব্যবহার না করলে এঁদেরও স্মৃতি আজ গরীয়ান হয়ে থাকত।

পর্তুগিজ বোম্বেটেরা বিজাতীয় বিদেশী। তারা মানবতার ধর্ম ক্ষুণ্ণ করেছিল বটে, কিন্তু স্বজাতির উপরে অত্যাচার করে নি। আর মারাঠী হানাদার বা বর্গীরা ভারতের বাসিন্দা হয়েও ভারতবাসীকে অব্যাহতি দেয় নি, তাই তাদের অপরাধ হয়ে উঠেছে অধিকতর নিন্দনীয়।

তিন

তখন মারাঠীদের সর্বময় কর্তা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর পৌত্র ও উত্তরাধিকারী মহারাজা সাহু। কেবল নিজ-মহারাষ্ট্রে নয়, মধ্য-ভারতেও ছিল তাঁর রাজ্যের এক অংশ। তাঁর অধীনে ছিলেন দুই-জন নায়ক—পেশোয়া (বা প্রধান মন্ত্রী) বালাজী বাজীরাও এবং নাগপুরের রাজা বা সামন্ত রঘুজী ভোঁসলে। তাঁরা পরস্পরকে দেখতেন চোখের বালির মত। দুজনেই দুজনকে বাধা দেবার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন।

শিবাজীর সময়ে এমন ব্যাপার সম্ভবপর হত না; কারণ সর্বময়

কর্তা বলতে ঠিক যা বোঝায়, শিবাজী ছিলেন তাই। অধীনস্থ নায়কদের চলতে-ফিরতে হত একমাত্র তাঁরই অঙ্গুলিনির্দেশে। সে-রকম ব্যক্তিত্ব বা শক্তি ছিল না মহারাজা সাহুর। অধীনস্থ নায়কদের স্বেচ্ছাচারিতা তিনি ইচ্ছা করলেও সব সময়ে দমন করতে পারতেন না। এই কথা মনে রাখলে পরবর্তী ঘটনাগুলির কারণ বোঝা কঠিন হবে না।

কবিবর ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—'স্বপ্ন দেখি বর্গীরাজ হইল ক্রোধিত।'

তাঁর আর-একটি উক্তি শুনলে সন্দেহ থাকে না যে, কাকে তিনি 'বর্গীরাজ' বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতচন্দ্র বর্গীর হাঙ্গামার সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি বলেছেন—

'আছিল বর্গীর রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥'

'সেতারা' বা সাতারার রাজা বলতে সাহুকেই বোঝায়। যদিও বর্গীরা 'চৌথ' আদায়ের নামে যে টাকা আদায় করত তার মধ্যে তাঁরও অংশ থাকত, তবু বর্গীর হাঙ্গামার সঙ্গে সাহুর যোগ ছিল প্রত্যক্ষ ভাবে নয়, পরোক্ষ ভাবে।

'চৌথ' হচ্ছে সাধারণত রাজস্বের চারভাগের এক ভাগ। মারাঠীদের দ্বারা ভয় দেখিয়ে বা হানা দিয়ে চৌথ বলে টাকা আদায়ের প্রথা শিবাজীর আগেও প্রচলিত ছিল। তবে শিবাজীর সময়েই এর প্রচলন হয় বেশি। কিন্তু তখনো তার মধ্যে যে যুক্তি ছিল, সাহুর সময়ে তা আর খাটত না, তখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যথেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র বা নিছক দস্যুতার সামিল।

চৌথের নিয়মানুসারে টাকা আদায় করবার কথা বৎসরে একবার মাত্র। কিন্তু বর্গীরা টাকা আদায় করতে আসত যখন-তখন। হয়ত একদল বর্গীকে টাকা দিয়ে খুশি করে প্রজাদের মান ও প্রাণ বাঁচানো হল। কিন্তু অনতিবিলম্বে এসে হাজির নূতন আর-একদল বর্গী। তারা আবার টাকা দাবি করে। সে দাবি মেটাতে না পারলেই সর্বনাশ। অমনি শুরু হয়ে যায় লুঠতরাজ ও খুনখারাপি—সে এক বিষম ডামাডোলের ব্যাপার।

সময়ে এবং অসময়ে অর্থাৎ প্রায় সব সময়েই বর্গীদের এই যুক্তি-হীন ও অসম্ভব দাবি মেটাতে মেটাতে অবশেষে বাংলাদেশের নাভি-শ্বাস ওঠবার উপক্রম। কি রাজার এবং কি প্রজার হাল ছাড়বার অবস্থা আর কি!

এই সব নচ্ছার ও পাষণ্ড হানাদারদের কবল থেকে বাঙালীরা মুক্তি পেলে কী উপায়ে, এইবারে আমরা সেই কাহিনীই বর্ণনা করব।

কিন্তু তার আগে আর-একটা কথা বলে রাখা দরকার। আগেই বলা হয়েছে বর্গীর হাঙ্গামা বিশেষ করে বাংলাদেশেরই ব্যাপার। বাদশাহী আমলে এক একটি 'সুবা'র অন্তর্গত ছিল এক একজন সুবাদার বা শাসনকর্তার অধীনস্থ এক একটি প্রদেশ। বাংলার সঙ্গে তখন যুক্ত ছিল বিহার ও উড়িষ্যা দেশও এবং বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে এদের সুবাদার ছিলেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। ইংরেজদের আমলেও প্রায় শেষ পর্যন্ত বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা ছিলেন একজন

প্রাচীনকালে—অর্থাৎ ভারতবর্ষে-মুসলমানদের আগমনের আগেও দেখি, বাংলার সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যার কতকাংশ একই রাজ্য বলে গণ্য হয়েছে। বাঙালী মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক প্রভৃতি এমনি রাজ্যই

শাসন করতেন। বাঙালীর সঙ্গে বিহারী ও ওড়িয়ারা তখন নিজেদের একই রাজ্যের বাসিন্দা বলে আত্মপরিচয় দিত,—'বিহার কেবল বিহারীদের জন্যে' বা 'উড়িষ্যা কেবল ওড়িয়াদের জন্যে',—এ সব জিগির আওড়াবার চেষ্টা করত না। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রেই এ দেশে এই শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ জাতিবিদ্বেষের জন্ম হয়েছে।

বর্গী হানাদাররা পদার্পণ করেছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যুক্ত রঙ্গমঞ্চেই। তবে এ-কথা বলা চলে বটে, প্রধানত নিজ বাংলার উপরেই তাদের আক্রমণ হয়ে উঠেছিল অধিকতর জোরালো।

চার

শিবাজীর আমল থেকেই মারাঠী সৈনিকরা লুণ্ঠনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, আগেই বলা হয়েছে এ কথা।

তখনকার কালে ভারতীয় হিন্দুদের পক্ষে এ-সব হামলা ছিল তবু কতকটা সহনীয়। কারণ ধর্মদ্বেষী মুসলমানদের বহুযুগব্যাপী অত্যাচারের ফলে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত সমগ্র হিন্দুজাতি অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শিবাজীর অতুলনীয় প্রতিভাই সর্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত করলে এমন এক বৃহৎ ও পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য, যার বিরুদ্ধে মহামোগল ও হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাট ঔরংজেবেরও প্রাণপণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রধানত মুসলমানদের কাহিল করার জন্যেই শিবাজী লুঠতরাজ চালিয়ে যেতেন মোগল সাম্রাজ্যের দিকে দিকে; সেই সূত্রে মোগল সম্রাটের হিন্দু প্রজারাও হানাদারদের কবলে পড়ে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হত বটে, তবে সে ব্যাপারটা সবাই খুব বড় করে দেখত বলে মনে হয় না।

কিন্তু যখন ভারতে মুসলমানরা ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়ছে এবং প্রায় সর্বত্রই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে মারাঠীদের প্রভুত্ব, তখনো বর্গী হানাদাররা তাদের স্বধর্মাবলম্বী নাগরিক ও গ্রামীণদের উপরে চালিয়ে যেতে লাগল অসহনীয় ও অবর্ণনীয় অত্যাচার এবং তার মধ্যে কিছুমাত্র উচ্চাদর্শের পরিবর্তে ছিল কেবল নির্বিচারে যেন তেন প্রকারে নিছক দস্যুতার দ্বারা লাভবান হবার দুশ্চেষ্টা। যেখান দিয়ে বর্গী হানাদাররা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়, সেখানেই পিছনে পড়ে থাকে কেবল সর্ববিষয়ে রিক্ত, ধূ-ধূ-করা হাহাকার-ভরা মহা-শ্মশান। এতটা বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠল এবং বাংলার সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যাও পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল।

এক হিসেবে হুন আটিলা ও গ্রীক আলেকজাণ্ডার উভয়কেই দস্যু বলে মনে করা চলে। কারণ তাঁরা দুজনেই স্বদেশ ছেড়ে বেরিয়ে পরের দেশে গিয়ে হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে আলেক-জাণ্ডার বরেণ্য ও আটিলা ঘৃণ্য হয়ে আছেন। তার কারণ একজনের সামনে ছিল মহান আদর্শ, আর একজন করতে চেয়েছিলেন শুধু নরহত্যা ও পরস্বাপহরণ। বর্গীদের দলপতিরা ছিল শেষোক্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব

সেটা হচ্ছে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পাঠানদের দমন করবার জন্যে নবাব আলিবর্দী খাঁ গিয়েছিলেন উড়িষ্যায়। জয়ী হয়ে ফেরবার মুখে মেদিনীপুরের কাছে এসে তিনি খবর পেলেন, মারাঠী সৈন্যেরা অসৎ উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে বাংলার দিকে।

তার কিছুদিন পরে শোনা গেল, মারাঠীরা দেখা দিয়েছে বাংলার ভিতরে, বর্ধমান জেলায়। চারিদিকে তারা লুঠপাট, অত্যাচার ও রক্তপাত করে বেড়াচ্ছে।

দুঃসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আলিবর্দী বর্ধমানের দিকে রওনা হতে বিলম্ব করলেন না। কিন্তু তিনি বোধহয় মারাঠীদের সংখ্যা আন্দাজ করতে কিংবা তাড়াতাড়ির জন্যে উচিতমত সৈন্য সঙ্গে আনতে পারেন নি—কারণ তাঁর ফৌজে ছিল মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক।

তাঁকে রীতিমত বিপদে পড়তে হল। সংখ্যায় মারাঠীরা ছিল অগণ্য। তারা পিল-পিল করে চারদিক থেকে এসে তাঁকে একেবারে ঘিরে ফেললে। সম্মুখ-যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করা অসম্ভব দেখে আলিবর্দী বর্ধমানেই ছাউনি ফেলতে বাধ্য হলেন।

মারাঠীদের নায়কের নাম ছিল ভাস্কর পণ্ডিত। নাগপুরের রাজা রঘুজী ভেঁাসলের সেনাপতি। নিজের ফৌজকে তিনি দুই অংশে বিভক্ত করলেন। এক অংশ আলিবর্দীকে বেষ্টন করে পাহারা দিতে লাগল। আর একদল ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে এবং চল্লিশ মাইল-ব্যাপী জায়গা জুড়ে আরম্ভ করলে লুঠতরাজ, হত্যাকাণ্ড ও অকথ্য অত্যাচার।

ভাস্কর পণ্ডিতের দলবল এমনভাবে আটঘাট বেঁধে বসে রইল যে, কোনদিক থেকেই নবাবী ফৌজের ছাউনির ভিতরে আর রসদ আমদানি করবার উপায় রইল না। শিবিরের মধ্যে কেবল সেপাইরা নয়, সেই সঙ্গে হাজার হাজার অনুচর এবং নবাবের পরিবারবর্গও বন্দী হয়েছিল, আহার্যের অভাবে সকলের অবস্থাই হয়ে উঠল দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত।

অবশেষে আলিবর্দী মরিয়া হয়ে মারাঠীদের সেই চক্রব্যূহ ভেদ করে সদলবলে কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁকে বেশিদূর যেতে হল না, আশপাশ থেকে আচম্বিতে মারাঠীরা

হুড়মুড় করে এসে পড়ে চিলের মত ছোঁ মেরে নবাবী ফৌজের মোট-ঘাট ও তাঁবুগুলো কেড়ে নিয়ে কোথায় সরে পড়ল। আলিবর্দী তাঁর পক্ষের সকলকে নিয়ে খোলা আকাশের তলায় অনাহারে কর্দমাক্ত ধানক্ষেতের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন ; সে এক বিষম ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা—তিনি না পারেন এগুতে না পারেন পেছুতে।

কেটে গেল এক দিন ও দুই রাত্রি দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে।

উদরে নেই অন্ন, মাথার উপরে নেই আচ্ছাদন। হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি! দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে আলিবর্দীর সাহসী আফগান অশ্বারোহীর দল সবেগে ও সতেজে ঝাঁপিয়ে পড়ল মারাঠীদের উপরে এবং সে প্রবল আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে শত্রুরা পিছু হঠে যেতে বাধ্য হল।

নবাবী ফৌজ অগ্রসর হল কিছুদূর পর্যন্ত। তারপর শত্রুরা ফিরে-ফিরতি প্রতি-আক্রমণ শুরু করলে কাটোয়ার অনতিদূরে। সেখানে একটা লড়াই হল, কিন্তু শত্রুরা নবাবের গতিরোধ করতে পারলে না, নিজের অনশনক্লিষ্ট সৈন্যদল নিয়ে তিনি কাটোয়ার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

নবাবী শিকার হাতছাড়া হল বটে, কিন্তু মারাঠীরা বাংলার মাটি ছাড়বার নাম মুখে আনলে না। রক্তের স্বাদ পেলে বাঘের হিংসা যেমন বেড়ে ওঠে, অতি সহজে অতিরিক্ত ঐশ্বর্যলাভের আশায় ভাস্কর পণ্ডিতের লোভও আরো মাত্রা ছাড়িয়ে উঠল, অবাধে লুঠপাট করার জন্যে লেলিয়ে দিলেন নিজের পাপসঙ্গীদের।

পাঁচ

আলিবর্দী তখনো পর্যন্ত রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করতে পারেন নি।

সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন সুচতুর ভাস্কর পণ্ডিত। সাতশত বাছা বাছা অশ্বারোহী নিয়ে চল্লিশ মাইল পথ পার হয়ে তিনি অরক্ষিত মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে এসে পড়লেন।

চারিদিকে হুলুস্থূল! বাড়িতে নয়, গ্রামে নয়, নিজ রাজধানীর উপরে ডাকাতের হানা! কে কবে শুনেছে এমন আজব কথা? যারা পারলে, জোরে পা চালিয়ে গেল পালিয়ে। যারা পারলে না, ভয়ে মুখ শুকিয়ে জপতে লাগল ইষ্টনাম।

শহরতলি থেকে শহরের ভিতরে—এ আর আসতে কতক্ষণ! বর্গীরা হৈ-হৈ করে মুর্শিদাবাদের মধ্যে এসে পড়ল—ঘরে ঘরে চলল লুঠতরাজের ধুম, বিশেষত ধনীদের প্রাসাদে প্রাসাদে হিন্দু এবং মুসলমান কেউ পেলে না নিস্তার।

এক জগৎশেঠকেই গুণে গুণে দিতে হল নগদ তিন লক্ষ টাকা! সে যুগের তিন লাখ টাকার দাম ছিল এ-যুগের চেয়ে অনেকগুণ বেশি।

বর্গীদের বাধা দেয় শহরে ছিল না এমন রক্ষী। তারা মনের সাধে অবাধে গোটা দিন ধরে নিজেদের ট্যাঁক ভারী করতে লাগল—সকলে ভেবে নিলে, আর রক্ষা নেই, এইবার বুঝি সর্বনাশ হয়।

এমন সময়ে কাটোয়ার পথ থেকে দলবল নিয়ে স্বয়ং আলিবর্দী এসে পড়লেন হন্তদন্তের মত।

বর্গীরাও যথাসময়ে সরে পড়তে দেরি করলে না, সোজা গিয়ে হাজির হল কাটোয়ায় এবং আশ মিটিয়ে নিঃশেষে মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করতে পারলে না বলে আক্রোশে যাবার পথে দুই পাশের গ্রামের পর গ্রামে আগুন লাগিয়ে যেতে লাগল। চিহ্নিত হয়ে রইল তাদের সমগ্র যাত্রাপথ উত্তপ্ত ভস্মস্তূপে।

কাটোয়া হল বর্গীদের প্রধান আস্তানা। সেখান থেকে হুগলী এবং তারপর তারা দখল করলে আরো গ্রাম ও নগর। রাজমহল থেকে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি তারা অধিকার করে বসল। গঙ্গার পশ্চিম দিক থেকে বিলুপ্ত হল নবাবের প্রভুত্ব—এমনকি জমিদাররা পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাদের রাজস্ব দিতে লাগল এবং তাদের বশ্যতা স্বীকার করলে ফিরিঙ্গি বণিকরাও।

গঙ্গার পূর্বদিকের ভূভাগ আলিবর্দীর হস্তচ্যুত হল না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে সে অঞ্চলেও বর্গীরা হানা দিতে ছাড়লে না। তাদের উৎপাতের ভয়ে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা গঙ্গার পশ্চিম দিক ছেড়ে পালিয়ে এল।

বাংলা দেশ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল বললেই চলে। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম ; বাজারে শস্যের অভাব, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য ; শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে উঠল ; যারা তুঁতের আবাদ করে তারা পালিয়ে গেল—কারণ বর্গীরা তুঁতগাছের পাতা ঘোড়াদের খোরাকে পরিণত করলে, যা ছিল গুটিপোকাদের প্রধান খাদ্য। ফলে আর রেশম প্রস্তুত হত না—এমনকি যারা রেশমী কাপড় বুনত তারাও হল দেশছাড়া এবং রেশমের কারবারও হল স্থায়িভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে কিছু কিছু তুলে দিলে আসল অবস্থা উপলব্ধি করা সহজ হবে।

একজন বলছেন, 'আপন আপন সম্পত্তি নিয়ে সকলেই পলায়ন করতে লাগল। আচম্বিতে বর্গীরা এসে তাদের চারিধার থেকে ঘিরে ফেললে। আর সব কিছু ছেড়ে তারা কেড়ে নিতে লাগল কেবল সোনা আর রূপা। আর অনেকের হাত, অনেকের নাক ও কান কেটে নিলে এবং অনেককে মেরে ফেললে একেবারেই। স্ত্রীলোকদেরও উপরে অত্যাচার করতে বাকি রাখলে না। আগে বাইরের লুঠপাট সেরে তারা গ্রামের ভিতরে ঢুকে পড়ত এবং আগুন লাগিয়ে দিত ঘরে ঘরে। দিকে দিকে হানা দিয়ে তারা অশ্রান্ত স্বরে চিৎকার করত—আমাদের টাকা দাও, আমাদের টাকা দাও, আমাদের টাকা দাও। যারা টাকা দিতে পারত না, তাদের নাকের ভিতর তারা সুড়সুড় করে জল ঢেলে দিত কিংবা পুকুরে ডুবিয়ে মেরে ফেলত। লোকে নিরাপদ হতে পারত কেবল ভাগীরথীর পরপারে গিয়ে।

প্রাচীন কবি গঙ্গারাম তাঁর রচিত 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' কাব্যে বর্গীর হাঙ্গামার চিত্র দিয়েছেন :

'এই মতে সব লোক পলাইয়া যাইতে।
আচম্বিতে বরগী ঘেরিলা আইসে সাথে ॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা, রূপা লুঠে নেয় আর সব ছাড়া ॥
কারু হাত কাটে কারু কাটে কান।
একই চোটে কারু বধয়ে পরাণ ॥'

বর্ধমানের মহাসভার সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বলেছেন : সাহু রাজার সেপাইরা নৃশংস ; গর্ভবতী-নারী, শিশু, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের হত্যাকারী, বন্যপ্রকৃতি। তাবৎ লোকের উপরে দস্যুতা করতে দক্ষ এবং যে-কোন পাপ কাজ করতে সক্ষম। তাদের প্রধান

শক্তির কারণ, আশ্চর্যরূপে দ্রুতগতি অশ্ব। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখলেই তারা ঘোড়ায় চড়ে অন্য কোথাও চম্পট দেয়।

বর্গীদের চারিত্রিক বিশেষত্ব বোঝা গেল। তারা দস্যু, তারা নির্মম, তারা কাপুরুষ। মহারাষ্ট্রের বিশেষ গৌরবের যুগেও একাধিকবার মারাঠী চরিত্রের এইসব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। দিল্লীর মুসলমানরাও এইজন্যে তাদের দারুণ ঘৃণা করত।

বর্ষা এল বাংলায়, ঘাট-মাঠ-বাট জলে জলে জলময়, অচল পথ-চলাচল। বর্গীদেরও দায়ে পড়ে অলস হয়ে থাকতে হল।

আলিবর্দী রাজধানীর বাইরে এসে প্রচুর সৈন্যবল সংগ্রহ করে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

ভাস্কর পণ্ডিতও তলে তলে তৈরি হবার চেষ্টা করলেন। আরো বেশি ফৌজ পাঠাবার জন্যে আবেদন জানালেন নাগপুরের রাজা রঘুজীর কাছে। কিন্তু তাঁর আবেদন মঞ্জুর হল না। কারণ হয়ত সৈন্যাভাব।

আলিবর্দী ছিলেন অভিজ্ঞ সেনাপতি। তিনি বেশ বুঝলেন, নদী নালায় জল শুকিয়ে গেলে বর্গীদের বেগবান ঘোড়াগুলো আবার কর্মক্ষম হয়ে উঠবে। এই হচ্ছে তাদের কাবু করবার মাহেন্দ্রক্ষণ!

দুর্জন হলে কী হয়, ভাস্করের ভক্তির অভাব নেই। জমিদারদের কাছ থেকে জোর করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আদায় করে তিনি মহাসমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করলেন কাটোয়া শহরে।

নবমীর রাত্রি। পূজা ও আমোদ-প্রমোদের পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আনন্দশ্রান্ত মারাঠীরা অচেতন হয়ে পড়ল গভীর নিদ্রায়।

কিন্তু আলিবর্দী ও তাঁর বাছা-বাছা সৈনিকের চোখে নেই নিদ্রা। গোপনে গঙ্গা ও অজয় নদী পার হয়ে আলিবর্দী সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঘুমন্ত দস্যুদের উপরে।

বেশি কিছু করতে হল না এবং লোকক্ষয়ও হল না বেশি। সব-দিক দিয়েই সফল হল এই অভাবিত আক্রমণ।

প্রায় বিনা যুদ্ধেই বিষম আতঙ্কে পাগলের মত বর্গীরা বেগে পলায়ন করলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। তাদের সমস্ত রসদ, তাঁবু ও মোটঘাট হল আক্রমণকারীদের হস্তগত।

ফৌজ নিয়ে বাংলা ছেড়ে পালাতে পালাতে ও লুঠপাট করতে করতে ভাস্কর পণ্ডিত কটক শহরে গিয়ে আবার এক আড্ডা গাড়বার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু আলিবর্দী তাঁর পিছনে লেগে রইলেন ছিনে জোঁকের মত —তাঁকে আর হাঁপ ছাড়বার বা নূতন শক্তিসঞ্চয় করবার অবসর দিলেন না। ভাস্করকে কটক থেকেও তাড়িয়ে একেবারে চিল্কা পার করে দিয়ে অবশেষে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। তারপর বিজয়ী বীরের মত ফিরে এলেন নিজের রাজধানীতে। এ হল ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

ছয়

ভাস্কর পণ্ডিত তখনকার মত বিতাড়িত হলেও বাংলা দেশ থেকে বর্গীদের আড্ডা উঠে যায় নি।

কারণ কিছু দিন যেতে-না-যেতেই দেখি, তাঁর মুরুব্বি রঘুজী ভোঁসলেকে নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত আবার হাজির হয়েছেন কাটোয়া শহরে, তাঁরা নাকি সাহু রাজার হুকুমে বাংলার চৌথ আদায় করতে এসেছেন।

রাজা রঘুজীর মস্ত শত্রু মারাঠীদের প্রথম পেশোয়া বালাজী রাও। তিনিও দলে দলে সৈন্য নিয়ে বিহারে এসে উপস্থিত হলেন। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের অনুরোধে রঘুজীকে তিনি বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিতে এসেছেন।

কিন্তু সব শিয়ালের এক রা! বালাজীও লক্ষ্মীছেলে নন, কারণ তিনিও এলেন দিকে দিকে হাহাকার তুলে লুঠপাট করতে করতে। সাঁওতাল পরগণার বনজঙ্গল ভেদ করে তিনি এসে পড়লেন বীরভূমে, তারপর ধরলেন মুর্শিদাবাদের পথ।

বহরমপুরের কাছে গিয়ে আলিবর্দী দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। পরামর্শের পর স্থির হল, নবাবের কাছ থেকে বালাজী বাইশ লক্ষ টাকা চৌথ পাবেন এবং তার বিনিময়ে তিনি করবেন বাংলা থেকে রঘুজীকে তাড়াবার ব্যবস্থা।

সেই খবর পেয়েই রঘুজী কাটোয়া থেকে চম্পট দিলেন চটপট। বালাজীও তাঁর পিছনে পিছনে ছুটতে কসুর করলেন না। এক জায়গায় দুই দলে বেধে গেল মারামারি। সেই ঘরোয়া লড়াইয়ে হেরে এবং অনেক লোক ও মালপত্র খুইয়ে রঘুজী ও ভাস্কর পণ্ডিত লম্বা দিলেন উড়িষ্যার দিকে। কর্তব্যপালনের জন্যে যথেষ্ট ছুটোছুটি করা হয়েছে ভেবে বালাজীও ফিরে গেলেন পুণার দিকে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ করলে প্রায় নয়মাসব্যাপী শান্তিভোগ। কিন্তু বাংলা ও বিহারের বাসিন্দারা নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল না,—বর্গীদের বিশ্বাস কি? কলকাতাবাসী ব্যবসায়ীরা পঁচিশ হাজার টাকা তুলে শহরের অরক্ষিত অংশে এক খাল খুঁড়ে ফেললে, সেই খালই 'মার্হাট্টা ডিচ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। বিহারীরাও পাঁচিল তুলে দিলে পাটনা শহরের চারিদিকে।

ইতিপূর্বে বর্গীরা তুই-তুইবার বাংলা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেও শেষপর্যন্ত লুঠের মাল নিয়ে সরে পড়তে পারে নি। সেইজন্যে ভাস্কর পণ্ডিতের আফসোসের অন্ত ছিল না। এখন বালাজীর অন্তর্ধানের পর পথ সাফ দেখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সংহার-মূর্তি ধারণ করে উড়িষ্যা থেকে আবার ধেয়ে এলেন বাংলার দিকে। চতুর্দিকে আবার উঠল সর্বহারাদের গগনভেদী হাহাকার, গ্রামে গ্রামে দেখা গেল দাউ-দাউ-দাউ লেলিহান অগ্নিশিখা, পথে পথে ছড়িয়ে রইল অসহায়দের খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহ। বর্গী এল—আবার বর্গী এল দেশে!

আলিবর্দী দস্তুরমত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বালাজীকে রঘুজীর পিছনে লাগিয়ে তিনি অবলম্বন করেছিলেন সেই বহু পরীক্ষিত পুরাতন কৌশল—অর্থাৎ যাকে বলে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। কিন্তু ব্যর্থ হল সে কৌশল—আবার বর্গী এল দেশে!

এখন উপায়? হতভম্ব রাবণ নাকি বলেছিলেন, 'মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী!' আজ আলিবর্দীরও সেই অবস্থা—বর্গীরা যেন রক্তবীজের ঝাড়। এই অমুঙ্গুলে ঝাড়কে উৎপাটন করতে হলে ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান ভুলে অন্য উপায় আবিষ্কার না করলে চলবে না। রাজকোষ অর্থশূন্য; বারংবার যুদ্ধযাত্রায় সৈন্যেরা পরিশ্রান্ত; বৃদ্ধ আলিবর্দীরও শরীর অপটু। এই সব বুঝে বর্গীদের জন্যে মোক্ষম দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যে তিনি এক গুপ্ত পরামর্শ-সভার আয়োজন করলেন।

ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে গেল আলিবর্দীর সাদর আমন্ত্রণ; নবাব আর যুদ্ধ করতে নারাজ এবং অক্ষম। তিনি এখন আপোসে মিটমাট করে শান্তি স্থাপন করতে ইচ্ছুক। ভাস্কর পণ্ডিত যদি

অনুগ্রহ করে নবাব শিবিরে পদার্পণ করেন, তাহলে সমস্ত গোলযোগ খুব সহজেই বন্ধুভাবে চুকে যেতে পারে।

ভাস্কর নিশ্চয়ই মনে করেছিলেন, বালাজীর মত তিনিও আলিবর্দীর কাছে নির্বিবাদে বহু লক্ষ টাকা হাতিয়ে বাজিমাৎ করতে পারবেন। কাজেই কিছুমাত্র সন্দেহ না করেই মাত্র একুশজন সঙ্গী সেনানী নিয়ে হাসতে হাসতে তিনি পদার্পণ করলেন নবাবের শিবিরে। সেদিনের তারিখ হচ্ছে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ।

ভাস্কর পণ্ডিত এবং বিশজন সেনানী আর বর্গীদের আস্তানায় প্রত্যাগমন করতে পারেন নি। শিবিরের আনাচে কানাচে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল দলে দলে হত্যাকারী। সহসা আবির্ভূত হয়ে তারা বর্গীদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললে। মাত্র একজন সেনানী সেই মারাত্মক খবর নিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল ভগ্নদূতের মত।

ব্যস্, এক কিস্তিতেই বাজিমাৎ! সেনাপতি ও অন্যান্য দল-পতিদের নিধনসংবাদ শুনেই বর্গী পঙ্গপালরা মহাভয়ে সমগ্র বঙ্গ ও উড়িষ্যা দেশ ত্যাগ করে পলায়ন করলে।

সাত

কিন্তু বর্গী এল, আবার বর্গী এল দেশে। এই নিয়ে চারবার এবং শেষবার।

সেনাধ্যক্ষ ভাস্করের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে এবার সসৈন্যে আসছেন স্বয়ং নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলে। গত

পনরো মাস ধরে তোড়জোড় ও সাজসজ্জা করে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে তিনি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

বর্গীদের কাছে বাংলা দেশ হয়ে উঠেছিল যেন 'কামধেনুর মত। দোহন করলেই দুগ্ধ।

রঘুজী আগে উড়িষ্যা হস্তগত করে বাংলার নানা জেলায় নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

আলিবর্দী বুঝলেন, এবার আর মুখের কথায় চিড়ে ভিজবে না। অতঃপর লড়াই ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু পনরো মাস সময় পেয়ে তিনিও যুদ্ধের জন্যে রীতিমত প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন।

প্রথমে দুই পক্ষে হল একটা ছোটখাট ঠোকাঠুকি। রঘুজী পিছিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর বিষদাঁত ভাঙল না। তারপর তিনি দশ হাজার বর্গী ঘোড়সওয়ার ও চার হাজার আফগান সৈনিক নিয়ে মুর্শিদাবাদের কাছে এসে পড়লেন। সেখানে নবাবী সৈন্যদের প্রস্তুত দেখে পশ্চাদপদ হয়ে ছাউনি ফেললেন কাটোয়া নগরে গিয়ে।

কাটোয়ার পশ্চিমে রানীদীঘির কাছে আলিবর্দীর সঙ্গে রঘুজীর চরম শক্তিপরীক্ষা হয়। এক তুমুল যুদ্ধের পর বর্গীরা যুদ্ধক্ষেত্রে বহু হতাহতকে ফেলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। ইহা ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

শেষপর্যন্ত আলিবর্দী বর্গীদের বাংলা দেশের সীমান্তের বাইরে তাড়িয়ে না দিয়ে নিশ্চিন্ত হন নি।

বর্গীরা শিকড় গেড়ে বসে উড়িষ্যায়। তারপরেও কয়েক বৎসর ধরে নবাবী ফৌজের সঙ্গে তাদের ঘাত-প্রতিঘাত হয় বটে, কিন্তু খাস বাংলার উপরে আর তারা চড়াও হয়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসে নি।

না আসবার কারণও ছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীদের সঙ্গে আলিবর্দীর যে শেষ সন্ধি হয় তার একটা শর্ত এই :

'বাংলার নবাব রাজা রঘুজীকে বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা চৌথ প্রদান করবেন'। *

* এই রচনার জন্যে আমি একাধিক লেখকের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। কিন্তু সমধিক সাহায্য পেয়েছি স্বর্গীয় স্যর যদুনাথ সরকারের মূল্যবান রচনা থেকে। —লেখক

পটভূমিকা

ইতিহাস যখন লিখিত হয় নি, জলদস্যু বা বোম্বেটের অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে তখন থেকেই। খৃষ্ট-পূর্ব যুগেও দেখা যায় প্রাচীন মিশর, গ্রীস ও রোমের সমুদ্রযাত্রী জাহাজ বোম্বেটেদের পাল্লা থেকে রেহাই পায় নি। এমনকি, বিশ্ববিখ্যাত রোমান দিগ্বিজয়ী জুলিয়াস সিজারকে পর্যন্ত একবার বোম্বেটেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ইংরেজীতে Pirate বলতে বুঝায় বোম্বেটে এবং গ্রীক Peirates থেকে ঐ শব্দটির উৎপত্তি। উপরন্তু পর্তুগীজ Bombardier শব্দটি ভেঙে গড়া হয়েছে বাংলায় চলতি 'বোম্বেটে' শব্দটি।

প্রাচীন ভারতবাসীরাও সাগরযাত্রায় বেরিয়ে যখন-তখন ধরা পড়ত বোম্বেটেদের ফাঁদে। তারপর অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের মাটিতে মুসলমানরা যে প্রথম ইসলামের পতাকা রোপণ করবার সুযোগ পায়, তারও মূলে ছিল ভারত সাগরের বোম্বেটেরাই। কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন কাহিনী, এখানে বলবার জায়গা নেই।

তারপর মধ্যযুগের য়ুরোপে ইংরেজ, ফরাসী, স্পেনীয়, পর্তুগীজ ও উত্তর-আফ্রিকার মুসলমান বোম্বেটেদের ভয়াবহ অত্যাচারে সমুদ্রযাত্রা অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে উঠেছিল এবং জলদস্যুতা পরিণত হয়েছিল একটি রীতিমত লাভজনক ব্যবসায়ে। ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্ত্য বোম্বেটেদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রেও। আফ্রিকা ও আমেরিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বোম্বেটেদের প্রাধান্য এতটা বেড়ে ওঠে যে, তারা জল ছেড়ে ডাঙায় নেমেও দেশের পর দেশে হানা দিতে ভয় পেত না।

বোম্বেটেদের সাহস বাড়বে না কেন ? বড় বড় ইংরেজ বোম্বেটে ইংলণ্ডের রাজাদের কাছ থেকেও আশকারা পেয়েছে। অনেক বোম্বেটের জন্ম আবার সম্ভ্রান্ত পরিবারে ; . স্পেন বা ফ্রান্সের সঙ্গে যখন লড়াই চলত, ইংলণ্ডের রাজারা তখন বোম্বেটেদেরও লেলিয়ে দিতে লজ্জিত হতেন না এবং তারাও প্রশ্রয় পেয়ে স্পেন বা ফ্রান্সের যে কোন জাহাজের উপরে হামলা দিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করত। হেনরি মর্গ্যান ছিল সতরো শতাব্দীর এক কুখ্যাত ইংরেজ বোম্বেটে। সে কেবল জলপথে নয়, স্থলপথেও শত শত নরহত্যা করেছে এবং নির্বিচার লুণ্ঠনের পর বহু জনপদকে করেছে অগ্নিমুখে সমর্পণ। তাকে বন্দী করে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়। কিন্তু রাজা দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ তার সঙ্গে আলাপ ক'রে এমন মুগ্ধ হলেন যে, শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, মর্গ্যানকে 'স্যর' উপাধিতে ভূষিত করে জামাইকা দ্বীপের শাসনকর্তার আসনে বসিয়ে দিলেন।

জনৈক ইংরেজ বোম্বেটে একবার ভারত সাগরে এসে মোগলদের জাহাজের উপরে চড়াও হয়ে বাদশাহ্ আলমগীরের পরিবারভুক্ত দুইজন রাজকন্যাকেও বন্দিনী করতে ভয় পায়নি।

সুন্দরবন ছিল আগে বর্ধিষ্ণু লোকালয়, পরে পরিণত হয়েছে বিজন জলা-জঙ্গলে। মানুষের বিচরণ-ভূমি দখল করেছে হিংস্র পশুর দল। কারণ ? পর্তুগীজ ও মগ বোম্বেটেদের অত্যাচার।

দুইজন মেয়ে-বোম্বেটেরও নাম বিখ্যাত—আন্ বোনী ও মেরি রীড। জাতে ইংরেজ। তাদেরও গল্প অতিশয় চিত্তাকর্ষক, কিন্তু আমরা বোম্বেটেদের ইতিহাস লিখতে বসি নি। ভূমিকার জন্যে যতটুকু চাই, ততটুকু ইঙ্গিতই দিলুম, আপাতত এ সম্বন্ধে আর বেশি বাক্যব্যয় করবার দরকার নেই। এইবার মূল কাহিনী শুরু করা যাক্।

যার কথা বলব তার আসল নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড টিচ্, কিন্তু 'কালোদেড়ে' ডাকনামেই সে সর্বত্র পরিচিত (যেমন কুখ্যাত মুসলমান বোম্বেটে উরুজ্ পরিচিত ছিল 'লালদেড়ে' ডাকনামে)। সে কেবল স্পেন ও ফ্রান্সের শত্রুই ছিল না, নিজের জাতভাই ইংরেজদেরও সুবিধা পেলে ছেড়ে দিত না এবং সমগ্র ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ তার নাম শুনলেই ভয়ে কেঁপে সারা হত। আঠারো শতাব্দীর প্রথম দিকেই তার উত্থান এবং পতন। আমেরিকায় তখন ইংরেজদেরই রাজত্ব।

দুই

নায়কের মঞ্চে প্রবেশ

উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ। তারই উত্তরে আছে সাতশো আশি মাইল লম্বা বাহামা দ্বীপপুঞ্জ—তাদেরও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। আমেরিকার দিকে যাত্রা করবার পর কলম্বসের চোখে পড়ে সর্বপ্রথমে বাহামা দ্বীপই।

বাহামার অন্যতম দ্বীপ নিউ প্রভিডেন্স এবং সেখানে ছিল বোম্বেটেদের জাহাজ ভিড়োবার এক মস্ত আড্ডা। আমাদের কাহিনীর সূত্রপাত সেখানেই।

বোম্বেটেদের নিজস্ব এক কালো পতাকার নাম ছিল 'জলি রোজার'—তার উপরে সাদা রঙে আঁকা থাকত কোণাকুনি ভাবে রক্ষিত দুটো অস্থিখণ্ডের উপরে একটা মড়ার মাথা। সাগরপথের

যাত্রীরা এই কৃষ্ণপতাকা বা 'জলি রোজার'কে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত ভয় করত। সৌভাগ্যের বিষয়, 'জলি রোজারে'র অস্তিত্ব আজ লুপ্ত।

নিউ প্রভিডেন্স দ্বীপের বোম্বেটে-বহরের জাহাজ-ঘাটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন কাপ্তেন বেঞ্জামিন হর্নিগোল্ড। লোকের চোখ ভোলাবার জন্যে তাঁর জাহাজের উপরে উড়ছে এখন ইংলণ্ডের রাজ-পতাকা বা 'ইউনিয়ন জ্যাক'। কিন্তু সমুদ্রে পাড়ি দিলেই সেখানে 'ইউনিয়ন জ্যাকে'র জায়গা জুড়ে বসবে সর্বনেশে 'জলি রোজার'—কারণ তিনি হচ্ছেন একজন নামজাদা জলদস্যু।

হর্নিগোল্ড আজ কয়েকদিন জাহাজ-ঘাটায় অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন একজন সহকারী অধ্যক্ষের জন্যে। সহকারী অধ্যক্ষের অভাবে জাহাজের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু শহরের বিভিন্ন শুঁড়িখানা ও গুণ্ডাপাড়ায় ঘুরেও তিনি মনের মত সহকারী খুঁজে পান নি এবং সেই অভাবের জন্যে তাঁর জাহাজ বন্দরের মধ্যেই বন্দী হয়ে আছে।

নিজের মনেই গজ্ গজ্ করে তিনি বললেন, "এমন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এক বেটা মনের মত পাষণ্ড গুণ্ডার পাত্তা পাওয়া গেল না! আমার জাহাজের খুনে বদমাশগুলোকে শায়েস্তা করতে হলে যে খোদ শয়তানের মত ধড়িবাজ লোক দরকার!"

আচম্বিতে কাছ থেকেই কে পাগলের মত হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল—দস্তুর মত শয়তানি হাসি।

চমকে উঠে নিজের পিস্তলের উপরে হাত রেখে হর্নিগোল্ড রুখে ফিরে দাঁড়ালেন—সত্যসত্যই কি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে এখানে এসে আবির্ভূত হয়েছে স্বয়ং শয়তান?

কিন্তু কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! এ যে কবির ভাষায়—"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!"

জাহাজ-ঘাটার অন্যান্য লোকদের মাথা ছাড়িয়ে উর্ধ্বে জেগে উঠেছে দৈত্যের মত এক অসম্ভব মনুষ্যদেহ—যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া! যেন বামনদের মাঝখানে এক বিরাট পুরুষ। তার মহা-বলিষ্ঠ বিপুল বপুর সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে লৌহকঠিন পেশীর পর পেশীর তরঙ্গায়িত গতি। সেই রুক্ষ কেশকণ্টকিত মুখে আগুনের ফিন্‌কির মত জ্বলছে দুটো কুচুটে কুৎকুতে চক্ষু! মাথায় পুরু কালো চুল—এবং চোখ-নাকের পাশে ও তলায় সে কী কৃষ্ণ ও ঘন শ্মশ্রুর ঘটা! কয়েকটা যত্নরচিত বেণীতে বিভক্ত হয়ে সেই প্রকাণ্ড চাপদাড়ি ঝুলে পড়েছে একেবারে কোমর পর্যন্ত! কেবল বিউনি বেঁধেই দাড়ির পরিচর্যা শেষ করা হয় নি—তার উপরে তাকে আবার অলংকৃত করা হয়েছে রঙ্‌চঙে সব রেশমী ফিতে দিয়ে! তার বক্ষ-বন্ধনীতে ঝুলছে তিনজোড়া পিস্তল এবং গলায় আছে সোনা ও রূপায় গড়া হার!

তারপর বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! মাথার টুপির তলা থেকে ঝুলে পড়ে কয়েকটা মৃদু-জ্বলনশীল পলিতা সেই ভীষণ মুখখানা অধিকতর ভয়াল ও বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে গন্ধকের উগ্র গন্ধে!

যেন অপচ্ছায়ামূর্তি! থতমত খেয়ে দুই পা পিছিয়ে পড়লেন হর্নিগোল্ড! এমন ধারণাতীত দৃশ্য তিনি জীবনে আর দেখেন নি।

পরমুহূর্তেই তাঁর সন্দেহ হল যে, মূর্তি তাঁকে দেখেই হাসছে যেন বিশ্রী ব্যঙ্গের হাসি!

এই কথা মনে হতেই কাপ্তেন হর্নিগোল্ড ক্ষেপে গিয়ে পিস্তল বাগিয়ে ধরে কুপিত কণ্ঠে বললেন, "ওরে কালোদেড়ে শয়তান, আমাকে দেখে ঠাট্টা? মজাটা দেখবি নাকি?"

কিন্তু কোন মজাই দেখানো হল না—ধাঁ করে তাঁর মনে পড়ে গেল একটা কথা। তাড়াতাড়ি গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, "টিচ্? তুমি কি এডওয়ার্ড টিচ্?"

—"সঠিক আন্দাজ! আমি এডওয়ার্ড টিচ্ই বটে, দেশ আমার ব্রিস্টলে।"

—"সবাই তোমাকে কালোদেড়ে বলে ডাকে তো?"

পলিতার আগুন তখন দাড়ির উপর নেমে এসেছে এবং চারিদিক ভরে উঠেছে গন্ধকের গন্ধের সঙ্গে চুল-পোড়া দুর্গন্ধে! কালোদেড়ে তার শ্মশ্রুর বেণীগুলো তাড়াতাড়ি কাঁধের উপরে তুলে দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, আমি কালোদেড়েই বটে! একটু আগেই আপনি যা বলছিলেন আমি শুনতে পেয়েছি। জাহাজের বেয়াড়া বেহেড লোকগুলোকে শায়েস্তা করবার জন্যে আপনার বেপরোয়া সহকারী দরকার?"

কালোদেড়ে কথা কইতে কইতে মিটমিট করে আড়চোখে তার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে দেখে তপ্ত হয়ে উঠল হর্নিগোল্ডের বুকের রক্ত! এমন দুঃসহ বেয়াদপি দেখলে যে-কোন বোম্বেটে-জাহাজের মালিক তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এই শ্রেণীর একজন দুষ্ট ও ধৃষ্ট সহকারীর অভাবে তাঁর জাহাজ অচল হয়ে পড়েছে বলে মনের রাগ মনেই চেপে তিনি বললেন, "তাহলে আমার জাহাজের অবাধ্য লোকগুলোর ভার আমি তোমার হাতেই সমর্পণ করলুম! কিন্তু তোমার ঐ যাচ্ছেতাই জ্বলন্ত পল্‌তেগুলো আর আমি সইতে পারছি না, ওগুলো নিবিয়ে ফেল।"

তিন

আগন্তুকের স্বরূপ

উপযোগী বাতাস পেয়ে জাহাজ বন্দর ছেড়ে ভেসে চলল আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দুদিন পরেই কাপ্তেন হর্নিগোল্ডের বুঝতে বাকী রইল না যে, সহকারীরূপে যাকে তিনি নিযুক্ত করেছেন, দুর্বৃত্ততায় সে শয়তানেরই জুড়ীদার বটে। কাপ্তেনের ঘরের আওতাতেই দাঁড়িয়ে সে নোংরা, অশ্রাব্য ভাষায় চেঁচিয়ে, শপথ করে এবং টুপি থেকে ঝুলন্ত পলিতাগুলোতে আগুন লাগিয়ে যথেচ্ছ ভাবে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই ছোঁড়ে ছয়-ছয়টা পিস্তল—কেউ হত বা আহত হল কিনা তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। একে তো সেই বিপুলবপু নরদানবের চেহারা, দেখলেই পেটের পিলে চমকে যায়, তার উপরে, তার পাশবিক গর্জন শুনে এবং পিস্তলগুলো নিয়ে মারাত্মক খেলা দেখে মহাপাষণ্ড বোম্বেটে-গুলো পর্যন্ত আতঙ্কে থরহরি কম্পমান দেহে জাহাজের আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দেয় এবং তাদের মুখের ভাব যেন জাহির করতে চায়—ছেড়ে দে বাবা, কেঁদে বাঁচি!

কালোদেড়ের সামনে গেলে সকলেরই অবস্থা হয় ভীরু ভেড়ার মত।

একদিন সে হাঁক ছেড়ে ডাক দিলে, "এই রাবিশের দল, আজ আমরা এক নিজস্ব নরক তৈরি করব! দেখব কতক্ষণ আমরা নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারি। চল্ সবাই জাহাজের নীচের তলায়!"

গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুড়ুম্! পিস্তলের পর পিস্তলের ধমক। ভয়ে

কেঁচোর মত বোম্বেটের দল নীচের তলায় গিয়ে হাজির হতে দেরি করলে না। তারপর দুম্-দাম্ করে বন্ধ করে দেওয়া হল সব দরজা। অগ্নিসংযোগ করা হল বড় বড় গন্ধকের কুণ্ডে। দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলল না বটে, কিন্তু হু-হু ক'রে গন্ধকের ধোঁয়া বেরিয়ে ক্রমেই কুণ্ডলীত ও পুঞ্জীভূত হয়ে সেই রন্ধ্রহীন বদ্ধ জায়গাটাকে করে তুললে ভয়ংকর দুঃসহ। দৃষ্টি হয়ে যায় অন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে আসে রুদ্ধ, অন্তিমকাল মনে হয় আসন্ন! অমন যে বেপরোয়া, নিষ্ঠুর, হিংস্র ও নরঘাতক বোম্বেটের দল, তারাও হাঁচতে হাঁচতে, কাশতে কাশতে, হাঁপাতে হাঁপাতে ও মৃত্যুভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে কালোদেড়ের সামনে বসে পড়ে আর্ত স্বরে চেঁচাতে লাগল—"প্রাণ যায়, বাঁচাও! দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও!"

দুই হাতে দুটো করে পিস্তল ছুঁড়তে ছুঁড়তে কালোদেড়ে বিকট স্বরে অট্টহাস্য করে নেচে নেচে বলে উঠল, "একবার নরকে ভর্তি হলে আমার শয়তানদাদা আর তোদের ছুটি দেবে না—এই বেলা সময় থাকতে থাকতে নরকবাসের অভ্যাসটা করে নে রে!"

—"গেলুম, গেলুম,—আর নয়! বাবা রে, দম বন্ধ হয়ে এল!"

তখন দরজা খুলে দিয়ে কালোদেড়ে গর্জন করে বললে, "কেমন. এখন বুঝলি তো, এ জাহাজের আসল কর্তা কে?"

জাহাজের উপর থেকে কালোদেড়ের আস্ফালন শুনতে শুনতে কাপ্তেন হর্নিগোল্ডের বুকটা কেঁপে উঠল। তিনি বুঝলেন, এমন সাংঘাতিক সহকারীর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করা অতিশয় বিপজ্জনক; ভাবতে লাগলেন, এখন কোন্ উপায়ে এই নারকীয় পাল্লা থেকে ভালোয় ভালোয় ছাড়ান পাওয়া যায়?

চার

কালোদেড়ের বিদায়ী সেলাম

আরো কয়েকদিন যেতে না যেতেই কাপ্তেনের ভয় আরো বদ্ধমূল হয়ে উঠল।

একদিন সমুদ্রে আবির্ভূত হল দুই-দুইখানা জাহাজ—তারা আসছে যথাক্রমে হাভানা ও বার্মুডা থেকে।

হর্নিগোল্ডের জাহাজে অমনি উড়িয়ে দেওয়া হল হাড় ও মড়ার মাথা আঁকা কালো 'জলি রোজার' পতাকা।

আগন্তুক দুই জাহাজই সেই অশুভ পতাকা দেখে শিউরে উঠে আত্মসমর্পণ করলে বিনা বাক্যব্যয়ে।

হর্নিগোল্ড জাহাজ দুখানা নিঃশব্দে লুণ্ঠন করলেন বটে, কিন্তু তাদের লোকজনদের অক্ষত দেহেই মুক্তি দিলেন। অকারণে তিনি রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু কালোদেড়ে দারুণ ক্রোধে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে গর্জন করে উঠল, "ওদের সবাইকে ফেলে দাও সমুদ্রে, ওরা মাছেদের খোরাক হোক্!"

হর্নিগোল্ড দৃঢ়স্বরে বললেন, "এ জাহাজের কাপ্তেন হচ্ছি আমি, তুমি হুকুম দেবার কেউ নও!"

কালোদেড়ে বললে, "মরা মানুষ কথা কয় না, সাক্ষ্য দিতে পারে না। আমি কাপ্তেন হলে কখনো ওদের ছেড়ে দিতুম না।"

হর্নিগোল্ড বললেন, "ভয় নেই, ভয় নেই। তুমি যাতে কাপ্তেন হতে পারো, শীঘ্রই আমি সে ব্যবস্থা করে দেব!"

কালোদেড়ের মুখে হাসি ফুটল বটে, কিন্তু সে-হাসি হচ্ছে দস্তুরমত বিষাক্ত।

বাসনা পূর্ণ হল না বলে মনের দুঃখ ভুলবার জন্যে সে সদ্যলুণ্ঠিত জাহাজ থেকে একটা মদের পিপে টেনে এনে নিজের দলের সবাইকে ডাক দিয়ে বললে, "চলে আয় সব তৃষ্ণার্তের দল! পেট-ভরে মদ খা আর প্রাণ-ভরে ফুর্তি কর!"

জাহাজের উপরে বইল যেন মদের ঢেউ। কালোদেড়ের টুপি থেকে লম্বমান জ্বলন্ত পলিতাগুলোও দেখাতে লাগল যেন অভিনব দেওয়ালির বাঁধা-রোশনাই। মদে চুমুকের পর চুমুক দিতে দিতে সে বলতে লাগল, "জানিস্ তোরা আমার বাহাদুরি? এ-অঞ্চলের বারোটা বন্দরে আছে আমার এক ডজন বউ—আমি কি যে-সে লোক রে? দুদিন সবুর করলেই দেখবি আমি হয়েছি নিজস্ব জাহাজের মালিক আর তার নাবিকরা হয়েছে পুরোপুরি আমারই তাঁবেদার!"

তার সাধ পূর্ণ হল দিনকয়েক পরেই।

সমুদ্রে ঢেউ কেটে এগিয়ে আসছে একখানা বাণিজ্যপোত।

বোম্বেটে-জাহাজের কৃষ্ণপতাকা দেখেও তার লোকজনরা দমল না, লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

কালোদেড়েও তো তাই চায়—মারামারি, রক্তারক্তি, খুনোখুনি! কাপ্তেন হর্নিগোল্ডকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সায় দিতে হল।

বোম্বেটে-জাহাজ থেকে হুংকার দিয়ে উঠল কামানের সারি এবং সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে তপ্ত বুলেট প্রেরণ করতে লাগল বন্দুকগুলোও। মড়্ মড়্ করে ভেঙে পড়ল বাণিজ্যপোতের কয়েকখানা তক্তা এবং শোনা গেল আহতদের সকরুণ আর্তনাদ।

দুই জাহাজ পাশাপাশি হতেই কান-ফাটানো ভৈরব গর্জন করে মহাকায় কালোদেড়ে মূর্তিমান অভিশাপের মত লাফ দিয়ে পড়ল বাণিজ্যপোতের উপরে এবং শূন্যে বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল তার রক্তলোভী, শাণিত ও বৃহৎ তরবারি। যারা বাধা দিতে এল তাদের কেউ প্রাণে বাঁচল না।

নিজের জাহাজে দাঁড়িয়ে কাপ্তেন হর্নিগোল্ড আশা করছিলেন শত্রুবেষ্টিত কালোদেড়ে এ-যাত্রা আর আত্মরক্ষা করতে পারবে না। একথাও ভেবেছিলেন, নিজেই পিস্তল ছুঁড়ে পথের কাঁটা দূর করবেন—কিন্তু হায়, পিস্তলের গুলি অতদূরে পৌঁছবে বলে মনে হল না।

ব্যর্থ হল হর্নিগোল্ডের আশা! শোনা গেল কালোদেড়ের ষণ্ড-কণ্ঠের সঙ্গে অন্যান্য বোম্বেটেদের হৈ-হুল্লোড়, জয়ধ্বনি! বাণিজ্য-পোত অধিকৃত এবং তার লোকলশ্কর হত বা আহত বা বন্দী।

বন্দী যাত্রীদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে কালোদেড়ে নির্দয় হুকুম দিলে, "ওদের সমুদ্রে ফেলে দে, ওরা মাছেদের উপবাস ভঙ্গ করুক!"

যাত্রীদের কণ্ঠে কণ্ঠে জাগল গগনভেদী ক্রন্দনধ্বনি, কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করে কালোদেড়ে বললে, "এইবারে বন্দী নাবিকদের ব্যবস্থা কর! যারা আমাদের দলে যোগ দিতে না চাইবে, তারাও হবে মাছেদের খোরাক! আহত শত্রুগুলোকেও ঐ সঙ্গে জলে ফেলে দে!"

চীৎকার ও হাহাকার কোন-কিছুতেই কান না পেতে বোম্বেটেরা কালোদেড়ের হুকুম তামিল করতে লাগল।

কালোদেড়ে চেঁচিয়ে হর্নিগোল্ডকে ডেকে বললে, "শুনুন কাপ্তেন! এ জাহাজখানা এখন আমাদের!"

হর্নিগোল্ড বললেন, "আমাদের নয় বাপু, খালি তোমার! আজ থেকে তুমি হলে কাপ্তেন টিচ্।"

'কাপ্তেনে'র পদে উন্নীত হয়ে কালোদেড়ের ওষ্ঠাধরের উপর দিয়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল বটে, কিন্তু মনে মনে সে সন্তুষ্ট হল না। এখানা হচ্ছে মাত্র 'স্লুপ্' (এক-মাস্তুলের ছোট জাহাজ), সে চায় বহু বড় বড় জাহাজের বহর চালনা করতে। হর্নিগোল্ডের জাহাজ-খানাও 'স্লুপ্' শ্রেণীভুক্ত।

কয়েকদিনের বিশ্রাম। তারপর আবার নূতন শিকারের সন্ধানে সমুদ্রযাত্রা।

দুই দিনের মধ্যেই জুটল এক পরম লোভনীয় শিকার—একখানা মস্তবড় ফরাসী জাহাজ।

চোখে-কানে ভালো করে কিছু দেখবার ও শোনবার আগেই বোম্বেটেদের জাহাজ দুখানা তীরবেগে তার দুই পাশে গিয়ে একসঙ্গে প্রচণ্ড গোলাগুলি বৃষ্টি করতে লাগল—ফরাসী জাহাজখানার অবস্থা হল টলোমলো, দলে দলে মাল্লা মৃত বা জখম হয়ে লুটিয়ে পড়ল এবং তারপরই দেখা গেল, এক রোমশ নরদানবের পিছনে পিছনে বোম্বেটেরা দলে দলে উঠছে আক্রান্ত জাহাজের পাটাতনের উপরে। তখনও যে-সব হতভাগ্য জীবন্ত ছিল তারাও জাহাজের পাটাতন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে সশরীরে করলে পাতালপ্রবেশ!

কালোদেড়ে তৎক্ষণাৎ সেই নূতন ও প্রকাণ্ড জাহাজের নাম রাখলে—"প্রতিহিংসা।"

তারপর জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললে, "ওহে নরকের খোকা হর্নিগোল্ড! তোমার ঐ পুঁচকে খেলো জাহাজকে আমি এইখান থেকেই বিদায়ী সেলাম ঠুকছি! আমি নিজের পছন্দ-

মাফিক জাহাজ পেয়েছি, তোমাকে এর মালপত্তরেরও ভাগ দেওয়া হবে না—হে হে হে হে, বুঝলে বাপু ?"

কাপ্তেন হর্নিগোল্ড কোন জবাব দিলেন না, নিজের জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আবার ফিরে চললেন নিউ প্রভিডেন্সের দিকে। বোম্বেটে-গিরিতে তাঁর ঘৃণা ধরে গিয়েছে, তিনি এই নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট ব্যবসায় ছেড়ে দেবেন।

পাঁচ

পলাতক রণতরী

কালোদেড়ের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে দেরি লাগল না।

প্রথমেই তার কবলগত হল একখানা ইংরেজ জাহাজ—"গ্রেট অ্যালেন"।

তারপরই প্রমাণিত হল কালোদেড়ে যে-সে সাধারণ বোম্বেটে নয়! সে কেবল আত্মরক্ষায় অক্ষম সওদাগরী জাহাজ দেখলেই তেড়ে এসে হাতিয়ার হাঁক্‌ড়ায় না এবং রণতরীর সামনে পড়লেই চটপট চম্পট দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে না।

"স্কারবরো" হচ্ছে ইংরেজদের বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ, তার পাটাতনে সাজানো সারে সারে ভারী ভারী কামান এবং তার নৌসৈন্যদের প্রত্যেকেই বন্দুকের অধিকারী।

হঠাৎ "স্কারবরো" গিয়ে হাজির বোম্বেটেদের "প্রতিহিংসা"র সামনে।

যুদ্ধজাহাজের নায়ক বরাবরই দেখে এসেছেন, রণতরীর সম্মুখীন

হলেই বোম্বেটেরা তাড়াতাড়ি জাহাজের সব পাল খাটিয়ে দিয়ে বাঘের সামনে ভীরু হরিণের মত পালাবার চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে তিনি আগে থাকতেই নিজের জাহাজের সব পাল তুলে দিয়ে কামান দাগতে দাগতে বেগে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য, "প্রতিহিংসা" পালাবার কোন চেষ্টাই করলে না!

মুখভরা হাসি নিয়ে নিজের জাহাজের পাটাতনের উপরে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালোদেড়ে, তার বেণীবদ্ধ শ্মশ্রু দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুই স্কন্ধের উপরে নিক্ষিপ্ত, তার টুপিতে সংলগ্ন প্রজ্বলিত পলিতাগুলো অগ্নিসর্পশিশুর মত জোর-হাওয়ায় দিকে দিকে ছিটকে পড়ে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে আগুনের হল্‌কা!

বোম্বেটে গোলন্দাজরাও কামানে অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যত হল।

কালোদেড়ে বললে, "আর একটু সবুর কর, এখনো কামান দাগার সময় হয় নি। ওদের আরো কাছে আসতে দাও।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দেখতে লাগল, দুই জাহাজের মাঝখানকার দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে! তারা প্রায় সামনাসামনি এসে পড়ল অবশেষে।

আচম্বিতে শূন্যে তরবারি চালনা করে কালোদেড়ে হুংকার দিয়ে হুকুম দিলে, "সময় হয়েছে! কামান ছোঁড়ো!"

"প্রতিহিংসা"র সমস্ত কামান একসঙ্গে গর্জন করে উঠল— গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুড়ম্!

যুদ্ধজাহাজ "স্কারবরো" প্রথম আক্রমণেই বেধড়ক মার খেয়ে একেবারে কাত হয়ে পড়ল! বিপুল বিস্ময়ে নৌসেনানায়ক কোন-রকমে নিজের রণতরী সামলে নিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে

পড়ে নিজেদের মানরক্ষা করতে না পারলেও রক্ষা করলেন পৈতৃক প্রাণগুলো।

বোম্বেটে-জাহাজের পিছনকার সব চেয়ে উঁচু পাটাতনের উপরে দেখা গেল—গগনভেদী চীৎকারে দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে বিরাটবপু কালোদেড়ে ইংরেজ নৌসেনাদের উপরে গালাগালি ও অভিশাপ বর্ষণ করছে এবং মাথার উপরে বন্‌বনিয়ে তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে কখনো-লাফ মারছে শূন্যপথে ও কখনো মেতে উঠছে তাণ্ডব নৃত্যে।

ছয়

গৌরবের তুঙ্গশিখরে

ইংরেজ রণতরীকে হারিয়ে দেবার পর কালোদেড়ের খাতিরের সীমা রহিল না। তার নাম শুনলেই দেহপিঞ্জর ছেড়ে ভয়ে উড়ে যেতে চায় লোকের প্রাণপাখি। বিশেষতঃ মালবাহী জাহাজী কাপ্তেনদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। যার দেখা পেলে যুদ্ধে নিরস্ত হয়ে পিট্‌টান দেয় ইংলণ্ডরাজের সশস্ত্র ও সসজ্জ রণতরী, তার সঙ্গে মুখোমুখি হলে নিরস্ত্র ও নির্বল সওদাগরী জাহাজ কতটুকু বাধা দিতে পারে?

না, বাধা দিতে পারে নি সত্যসত্যই। আর এই সত্য বোঝা গেল কিছুদিন যেতে-না-যেতেই। কারণ উপরি-উপরি কয়েকখানা জাহাজ বন্দী করে কালোদেড়ে হয়ে দাঁড়াল রীতিমত এক নৌ-বহরের অধিকারী। যে-সব জাহাজ উল্লেখযোগ্য মনে হল না, সেগুলোকে সে বিনাবাক্যব্যয়ে ডুবিয়ে দিলে মহাসাগরের অতল

পাতালে। সফল হল কালোদেড়ের বহুদিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—তার তাঁবে এখন এসেছে সত্যসত্যই নৌ-বহর। কোন সওদাগরী জাহাজ আজ অস্ত্রবলে বলীয়ান্ হলেও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।

বন্দী বা ধৃত জাহাজের অসংখ্য লোক প্রাণ দিলে বোম্বেটেদের বন্দুক বা অন্যান্য অস্ত্রের মুখে। তুলনায় তাদের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। কিন্তু যারা মরল না এবং যারা জখম হয়েও বেঁচে রইল তাদের পরিণাম হল মর্মবিদারক। কালোদেড়ের নিদারুণ নির্দেশে সাগরে ঝাঁপ খেতে বাধ্য হয়ে তাদের প্রত্যেকেই লাভ করলে সজ্ঞানে সলিলসমাধি। ভালোয় ভালোয় আত্মসমর্পণ করেও বাঁচোয়া নেই, কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়াও ব্যর্থ—কালোদেড়ের পাষাণ-হৃদয়ে কেউ দেখে নি দয়ামায়ার ছিটেফোঁটাও। তার মুখে শোনা যায় একই ধরনের উক্তি, "ওদের জোর করে ছুঁড়ে ফেলে দে সমুদ্রে! হোক্ ওরা মাছেদের খোরাক্—করুক্ ওরা হাঙরদের উদরপূরণ!"

সে সময় অসীম সাগরের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কত হাজার মানুষের তীব্র ক্রন্দনধ্বনি শুনে চমকিত হয়ে উঠেছিল প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি, কোথাও তার কোন হিসাব লেখা নেই!

তার দুষ্কর্মের সাক্ষ্য হতে পারে এমন কোন মানুষ বা জাহাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা কালোদেড়ের কাছে ছিল দস্তুরমত নির্বুদ্ধিতার কাজ।

সাত

কালোদেড়ের নতুন বউ

এক জাহাজের অধ্যক্ষকে বলে "ক্যাপ্তেন" এবং একাধিক জাহাজের অধ্যক্ষ "কমোডোর" নামে পরিচিত। কালোদেড়ে গ্রহণ করলে উচ্চতর "কমোডোর" উপাধি।

সে বললে, "আহা, আজ আমার মা বেঁচে থাকলে পুত্রের গৌরবে হতেন গৌরবিনী!"

কিন্তু মা পরলোকে গেলেও ইহলোকে বসে এতটা গৌরব চুপচাপ ধাতস্থ করাও যায় না। অতএব সে নির্দেশ দিলে—"উৎসব কর!"

কালোদেড়ের বোম্বেটে-শাস্ত্রে উৎসবের অর্থ হচ্ছে নারকীয় কাণ্ড। সাগরের দিকে দিকে তার নৌ-বহরের গোলন্দাজরা সমস্ত কামান থেকে ক্রমাগত অগ্নিবৃষ্টি করে দেখাতে লাগল বিরাট ও ভয়ঙ্কর আগ্নেয় দৃশ্য!

দৈবগতিকে ও দুর্ভাগ্যক্রমে যারা তথাকথিত উৎসবের সেই অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে এসে পড়ল, তারা যে কেউ ধনে-প্রাণে রক্ষা পেল না, সেকথা বলাই বাহুল্য। একে একে জলে ডুব মারলে চার-চারখানা লুণ্ঠিত জাহাজ।

তারপর নামে উৎসব শেষ হল বটে, কিন্তু জলপথে ছুটোছুটি করে জাহাজের পর জাহাজের উপরে হানা দিয়ে লুটতরাজ, রক্তপাত ও নরহত্যা প্রভৃতি পৈশাচিক কাণ্ড চলল অবিশ্রান্ত।

কালোদেড়ে ধনী যাত্রীদের কিন্তু প্রাণে মারত না, বন্দী করত। বন্দরে পৌঁছে আত্মীয়দের কাছে খবর পাঠিয়ে প্রচুর টাকা মুক্তিমূল্য

আদায় না করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হত না। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে ধনী বন্দীদের জড়োয়া গহনা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস লুণ্ঠিত হয়ে উঠত গিয়ে কালোদেড়ের প্রশস্ত ভাণ্ডারে। এইভাবেও সে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল।

ঐ অঞ্চলে সমুদ্রের চারিদিকে আছে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ। সেইসব নামহীন দ্বীপে কোন মানুষ বাস করে না, তাদের কোথায় কি আছে তাও কেউ জানে না। প্রবাদ, এমনি কোন অজানা দ্বীপে কালোদেড়ে এডওয়ার্ড টিচ্ তার বিপুল ঐশ্বর্য লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই গুপ্তধনের ঠিকানা কেউ আদায় করতে পারে নি।

কালোদেড়ে বলত, "আমি আর শয়তান ছাড়া আমার গুপ্তধনের ঠিকানা আর কারুর জানা নেই।"

তার বসনভূষণও এখন জাহির করে প্রচুর জাঁকজমক। তার হাতের প্রত্যেক আঙুলে শোভা পায় হীরা-পান্না বসানো আংটি। তার গলায় দোলে অনেকগুলো সোনার হারের লহর। তার বুকের বন্ধনীতে ঝোলে এখন নূতন যে তিনজোড়া পিস্তল, তাদের নল্‌চেগুলো রুপো দিয়ে গড়া এবং তাদের কুঁদোগুলো মূল্যবান প্রস্তর দিয়ে অলঙ্কৃত।

কালোদেড়ের এক প্রধান সহকারী ও প্রিয়পাত্র ছিল ইস্রায়েল হ্যাণ্ডস্। একদিন তাকে ডেকে সে চুপিচুপি বললে, "আমাদের দল কি অতিরিক্ত ভারী হয়ে পড়ে নি?

—"নিশ্চয়! এত লোককে লাভের অংশ দিতে দিতে আমাদের নিজেদের আয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।"

—"ঠিক ধরেছ হ্যাণ্ডস্! তাহলে কৌশলে অংশীদারের দল হালকা করে ফেলা যাক্!"

বিভিন্ন ওজর দেখিয়ে ছুইবারে ছুইদল লোককে বিজন দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে বাছা বাছা লোক নিয়ে কালোদেড়ে দূর-সমুদ্রে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—একবারও ভেবে দেখলে না যে, এতদিন বিশ্বস্তভাবে যারা তার হুকুম মেনে এসেছে, জনহীন অজানা দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়ে তাদের দুরবস্থা উঠবে কতখানি চরমে! পরে সে কেবল এইটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে হালকা দল নিয়ে কাজ করলে পকেট বেশী ভারি হয় বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার দিক দিয়ে সৃষ্টি হয় গুরুতর সমস্যা!

বৎসরকালব্যাপী লুটতরাজ ও নরমেধযজ্ঞের পর আটলাণ্টিক মহাসাগর ও তার তীরবর্তী দেশগুলো যখন হয়ে উঠেছে প্রায় অরাজক ও হত্যা-হাহাকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এবং সবাই যখন দুঃখে শোকে ক্রোধে একান্ত মরিয়া হয়ে কালোদেড়ের বিরুদ্ধে একবাক্যে করেছে বিদ্রোহ ঘোষণা, তখন সে একদিন অম্লান-বদনে বললে, "হ্যাণ্ডস্, চল নর্থ ক্যারোলিনার দিকে। দিন-রাত খালি জল আর জল দেখতে আমার আর ভালো লাগছে না!"

—"জল দেখা ছাড়া আর উপায় কি? স্থলে নামলেই তো আমাদের ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠের দোলনায় দুলতে হবে!

—"কুছ্ পরোয়া নেই। আমরা ফাঁসির দোলনায় দুলব না,—রাজার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করব।"

হ্যাণ্ডস্ সবিস্ময়ে বলে উঠল, "বলেন কি, কর্তা? মার্জনা ভিক্ষা? কে আমাদের মার্জনা করবে?"

—"গভর্নর চার্লস্ ইডেন আমাদের হাসিমুখে মার্জনা করবেন।"

—"বলেন কি, হাসিমুখে?"

—"হ্যাঁ। গভর্নর ইডেন বড় ভালো লোক হে। যুক্তি মানেন। আমার যুক্তি কি জানো ভায়া? উৎকোচ! ঘুষখোরকে বশ করা মোটেই কঠিন নয়।"

নর্থ ক্যারোলিনা হচ্ছে আমেরিকার আটলাণ্টিক সাগরতীরের একটি প্রদেশ। সেই প্রদেশের বাথ্ নগরে বাস করেন ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি চার্লস্ ইডেন। কালোদেড়ের জাহাজ গিয়ে নঙ্গর ফেললে সেইখানেই।

মানুষ চিনতে ভুল করেনি কালোদেড়ে। গভর্নর ইডেন তার যুক্তি অকাট্য বলেই মেনে নিলেন। উচিত মত উৎকোচ হজম করে তিনি কালোদেড়ের সমস্ত অপরাধ কেবল রাজার নামে ক্ষমাই করলেন না, উপরন্তু তার সঙ্গে জমে উঠল তাঁর দস্তুরমত দোস্তি—যাকে বলে দহরম্-মহরম্ আর কি! সবাই অবাক! হতভম্ব!

বাথ্ শহরের একটি মেয়েকে দেখে কালোদেড়ের ভারি পছন্দ হল। তৎক্ষণাৎ সে করলে বিবাহের প্রস্তাব। কন্যাও নারাজ নয়। তখন সদাশয় গভর্নর বললেন, "আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই শুভকার্য সম্পন্ন করব।"

এটি কালোদেড়ের ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বিবাহ তা ঠিক করে বলা যায় না। বিবাহে নীতবরের আসন গ্রহণ করলে গভর্নরের সেক্রেটারি টোবিয়াস নাইট! খুব ঘটা করে শুভকার্য সম্পন্ন হল বটে, তবে শহরের বনিয়াদী বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হয়েও উৎসবে যোগদান করলেন না।

কিন্তু কালোদেড়ে তাঁদের উপরেও নিলে একহাত! খুব জমকালো সাজপোশাক পরে সে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একে একে বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় আর দ্বারবান ও খানসামাদের

ডেকে বলে, "তোমাদের মনিবকে গিয়ে খবর দাও, স্বয়ং শ্রীমতী টিচ্ দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন।"

দ্বারবান ও খানসামাদের ইতস্তত করতে দেখলেই কালোদেড়ে তার রত্নখচিত ও রুপোয় বাঁধানো পিস্তলগুলো গুড়ুম্-গুড়ুম্ শব্দে ছুঁড়তে শুরু করে দেয়, দিকে দিকে বোঁ বোঁ করে ছুটতে থাকে গরমা গরম বুলেট এবং দ্বারবান ও খানসামারা হয় ভয়ে থরহরি কম্পমান। তারপরেই দরজা খুলতে ও গৃহস্বামীর আতিথ্যলাভ করতে বিলম্ব হয় না। কালোদেড়ে বারবার এইভাবে প্রমাণিত করলে সেই পুরাতন সত্যকথাটাই—জোর যার, মুল্লুক তার!

এখানে এসেও কিন্তু কালোদেড়ে নদী-পথে বোম্বেটেগিরি ছাড়ল না—বহু জাহাজ থেকে মালপত্তর ও ধনরত্ন লুণ্ঠিত হতে লাগল এবং বলা বাহুল্য যে, গোপনে তার লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত হলেন না স্বয়ং গভর্নরও!

জাহাজের মালিকদের কাছ থেকে অভিযোগ এলে গভর্নর ইডেন মুখে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করলেও কাজে কিছুই করেন না। জাহাজের মালিকরা শেষটা এখানে হতাশ হয়ে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ ভার্জিনিয়ার গভর্নর পট্স্উডের কাছে গিয়ে নিজেদের জরুরী নালিশ জানালেন।

ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে। গভর্নর স্পটস্উড তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দিলেন, যে কালোদেড়েকে গ্রেপ্তার বা বধ করতে পারবে, তাকেই হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের নৌ-বহরের দক্ষ যোদ্ধা লেফটেনাণ্ট রবার্ট মেনার্ডের উপরে উপরে হুকুম জারি হল, তিনি যেন অবিলম্বে কালোদেড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

গভর্নর ইডেনের সেক্রেটারি টোবিয়াসও কালোদেড়ের কাছ থেকে অল্পবিস্তর ঘুষ খেয়ে তার ভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ নৌ-সেনাদের এই যুদ্ধ-প্রস্তুতির কথা শুনেই সে প্রমাদ গুণে বোম্বেটের কাছে তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দিলে।

আট

শয়তানী ফুর্তি

কিন্তু খবর পেয়েও কালোদেড়ে কিছুমাত্র দমলো না বা ভীত হল না। নিজের দলের সবাইকে ডেকে অবহেলা-ভরে বললে, "ওহে, শুনেছ? টোবিয়াস্ চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, রাজার সৈন্যরা নাকি আমাদের শাস্তি দিতে আসছে! জাহান্নমে যাক্ রাজা! যারা আসতে চায় আসুক্ তারা! আমি তো জাঁকিয়ে বসে আছি নিজের আড্ডায়—সিংহের গহ্বরে ঢুকে ফেরুপাল কি করতে পারে?"

তখন সন্ধ্যাকাল। হ্যাণ্ডস্ ও আরো দুইজন বোম্বেটেকে নিয়ে কালোদেড়ে নিজের কামরার ভিতরে প্রবেশ করে খুব খুশীমুখে বললে, "আবার লড়াই হবে—কি মজা রে, কি মজা! ঢালো মদ, প্রাণ ভরে পান কর—আজ আমাদের আনন্দের দিন! দেখা যাক্, কে কত বেশী মদ খেতে পারে!"

একটা টেবিলের চারিদিক ঘিরে বসে চারজনে মিলে মদ্যপান শুরু করে দিলে। বাতির আলোতে খালি কালোদেড়ের গলার হার ও আঙুলের আংটিগুলো নয়, মুখের দাড়ি-গোঁফের ঘন জঙ্গলের ভিতর

থেকে তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটোও জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছিল—এবং জাহির করছিল যেন কোন নির্দয় কৌতুকের রহস্যময় ইশারা।

শয়তানের কাছে গিয়ে শয়তানি ছাড়া আর কি আশা করা যায়? বোধ করি সেই-কারণেই প্রচুর মদ্যপান করেও জনৈক চালাক বোম্বেটে নেশায় ঝিমিয়ে পড়েনি—নিজের দৃষ্টিকে রেখেছিল অত্যন্ত জাগ্রত।

হঠাৎ সে দেখলে, কালোদেড়ের দুটো পিস্তলসুদ্ধ দু'খানা হাত ধীরে ধীরে টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকল। সে চটপট উঠে দাঁড়িয়ে একটা ওজর দেখিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল উদ্‌ভ্রান্তের মত।

অকস্মাৎ বিকট চীৎকার করে কালোদেড়ে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিলে বাতিটা এবং অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়লে তার পিস্তলদুটো। তারপরেই আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ও ভয়াবহ আর্তনাদ এবং একটা ভারী দেহপতনের শব্দ।

তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দেখা গেল, হ্যাণ্ড্‌স্ দুই হাতে হাঁটু চেপে যন্ত্রণায় ছটফট করছে এবং তার আহত হাঁটু থেকে হু হু করে বেরুচ্ছে রক্তের ধারা।

একজন বোম্বেটে জিজ্ঞাসা করল, "এর অর্থ কি?"

হা হা করে হাসতে হাসতে কালোদেড়ে বললে, "এর অর্থ হচ্ছে, মাঝে মাঝে এক-একজনকে শাস্তি না দিলে সবাই ভুলে যাবে যে, এ জাহাজের আসল কর্তা কে?" তারপর সে হেঁট হয়ে পড়ে বললে, "চলে এস হ্যাণ্ড্‌স্, চলে এস—তোমার বিশেষ কিছুই হয়নি বাপু! হাঁটুর উপরে একটা ছোট্ট ছ্যাঁদা বৈ তো নয়, শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখালেই দুদিনে সেরে যাবে—কি বল হ্যাণ্ড্‌স্?"

কিন্তু হ্যাণ্ড্‌স্ কিছুই বললে না, পরদিন সকালেই তাকে দোলায় তুলে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

নয়

কালোদেড়ের প্রভাতী ভোজ

ওদিকে তরুণ নৌসেনাপতি লেফ্‌টেনান্ট মেনার্ড প্রস্তুত হচ্ছিলেন যুদ্ধের জন্যে।

বোম্বেটেদের জাহাজ তখন বাহির-সমুদ্রে ছিল না, একটা খাঁড়ির (স্থলভাগে প্রবিষ্ট সমুদ্রের অপ্রশস্ত অংশ) ভিতরে গিয়ে নোঙর ফেলে যুদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মেনার্ড বুঝলেন, তাঁর অধীনে 'নাইম' ও 'পার্ল্' নামে যে দু'খানা প্রকাণ্ড রণতরী আছে, গভীর সাগরে আনাগোনার উপযোগী করে তারা গঠিত। একে তো খাঁড়ির জলপথ সংকীর্ণ, উপরন্তু চড়া পড়েছে তার যেখানে-সেখানে—বড় জাহাজ ঢুকলেই চড়ায় আটকে অচল ও অকেজো হয়ে পড়বে।

কালোদেড়ের চালাকি বুঝে নিয়ে রণকুশল মেনার্ড তার ফাঁদে ধরা পড়তে রাজী হলেন না। তিনি 'স্লুপ্' বা এক-মাস্তুলের দু'খানা অপেক্ষাকৃত ছোট ও হালকা জাহাজ নির্বাচন করলেন—তারা অগভীর জলেও চলাফেরা করতে পারবে অনায়াসেই। তার উপরে তাদের আরো হালকা করবার জন্যে ভারী ভারী কামানগুলোও সরিয়ে ফেলা হল। পরিবর্তে আমদানি করা হল গাদি গাদি বন্দুক—বড় কামানের অভাব পূরণ করবে তাদের সংখ্যাধিক্যই।

খবর নিয়ে জানা গেল, বোম্বেটেদের দলে পঁচিশ জনের বেশী লোক নেই; কারণ কালোদেড়ে অতিরিক্ত লাভের লোভে দল অতিশয় হালকা করে ফেলেছে। মেনার্ড সঙ্গে নিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন

সৈন্য। পঞ্চাশজন বন্দুকধারীর সামনে দাঁড়ালে পঁচিশ জনকে পড়তে হবে যার-পর-নাই বেকায়দায়—এই ছিল তাঁর ধ্রুবধারণা।

অপরাহ্ন কাল।

খাঁড়ির বাঁকের মুখে আচম্বিতে দেখা গেল, দু'খানা জাহাজের মাস্তুলের চূড়া।

বোম্বেটে-জাহাজের প্রহরী চেঁচিয়ে উঠে বললে, "হুঁশিয়ার! দু'খানা জাহাজ আসছে!"

লাফ মেরে পাটাতনের উপরে উঠে কালোদেড়ে এক নজরে যা দেখবার সব দেখে নিয়ে বললে, "হুঁ, রাজার অভিযান! কিন্তু আমার এখানে আসার মজাটা ওদের ভালো করেই টের পাইয়ে দেব! বাছারা ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ তো দেখেনি!" সে তখনও জানত না তার ফাঁদ আছে মেনার্ডের নখদর্পণে!

রাজার জাহাজ কাছে এসে পড়ল।

কালোদেড়ে হাঁকলে, "কে তোমরা?"

মেনার্ড উত্তরে ধীর স্বরে বললেন, "টের পাবে অবিলম্বেই।"

তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি চালনা করে বুঝলেন যে, বোম্বেটেদের জাহাজখানা আকারে তাঁদের চেয়ে বিশেষ বড় না হলেও ওর মধ্যে নিশ্চয়ই গাদাগাদি করা আছে কামানের পর কামান। ওখানাও এমন হালকা ভাবে তৈরি যে এই বিপদসঙ্কুল অগভীর জলেও অনায়াসেই আনাগোনা করতে পারে!

ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন মেনার্ড। ওদের পোতপার্শ্বের কামানগুলোর দারুণ অগ্নিবৃষ্টিতে মুষড়ে পড়লে চলবে না, তাঁকে একেবারে বোম্বেটে-জাহাজের পাশাপাশি গিয়ে পড়ে মুষলধারে গুলিবৃষ্টি করে প্রথমেই

শত্রুদের রীতিমত অভিভূত করে ফেলতে হবে। সৈন্য ও বন্দুকের সংখ্যাধিক্যের উপরেই তাঁর প্রধান ভরসা।

কিন্তু জলে এখন ভাঁটার টান, সময়টা এখানকার যুদ্ধের পক্ষে উপযোগী নয়। জোয়ারের জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—এই স্থির করে মেনার্ড আজকের মত নোঙর ফেলবার হুকুম দিলেন।

সেদিন রাতে বারে বারে মাতাল কালোদেড়ে পাটাতনের উপরে ছুটে এসেছিল এবং ভয়ানক গলাবাজি করে জানিয়েছিল—"ওরে রাজার চাকরগুলো, কাল প্রভাতী খানার সময় তোদের সকলকেই হতে হবে আমার শখের জলখাবার!"

মেনার্ড একবার ক্ষেপে গিয়ে উত্তরে বলেছিলেন, "ওরে শুয়োর, শোন্! তোর ঐ নোংরা উকুনভরা কালো দাড়িতে পেরেক মেরে তোকে আমার জাহাজের গায়ে লট্‌কে দেব—এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!"

রাজার জাহাজে নোঙর ফেলা হচ্ছে দেখে কালোদেড়ে আন্দাজে বুঝে নিলে যে, আপাতত বোম্বেটেরা নিরাপদ, কারণ সুচতুর শত্রুরা ভাঁটার সময়ে অগভীর জলে জাহাজ চালিয়ে বিপদে পড়তে চায় না। সকালে জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ শুরু হবে।

সে একজন বোম্বেটেকে কাছে ডেকে এনে, একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তার চোখের কাছে নাড়তে নাড়তে ফিসফিস করে বললে, "ওরে মুখ্যু, ভালো করে শুনে রাখ্! যদি দেখিস্ আমরা হেরে যাচ্ছি আর রাজার সেপাইরা আমাদের জাহাজের উপরে উঠে পড়েছে, তখনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে আমাদের বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দিবি! তারপর কি মজা হবে জানিস্ তো? দড়াম্

করে এক দুনিয়া-কাঁপানো ধুন্ধুমারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই মিলে সরাসরি গিয়ে নরক গুলজার করে তুলব। কিরে, পারবি তো?"

এই ভয়ানক প্রস্তাব শুনে বোম্বেটে-বাবাজীর আত্মা শুকিয়ে যাবার উপক্রম! মুখরক্ষা করবার জন্যে তবু সে কোনরকমে মাথা নেড়ে সায় দিলে।

কালোদেড়ে বললে, "যা তবে! বারুদখানায় গিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক্! কাল এস্পার কি ওস্পার!"

বোম্বেটে দুরু-দুরু বুকে কাঁপতে কাঁপতে প্রস্থান করল।

চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্না ফুটল। মদে শুক্‌নো গলা ভিজিয়ে নেবার জন্যে কালোদেড়ে নিজের কামরার দিকে ছুটল এবং যেতে যেতে আর একবার গর্জিত কণ্ঠে জানিয়ে দিয়ে গেল যে—"ওরে রাজার দাসানুদাসের দল! শুনে রাখ্ তোরা! রাত পোয়ালেই আমি তোদের হাড় খাব, মাস খাব আর চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব—হা হা হা হা হা হা!"

যুদ্ধজাহাজের দুর্দশা

ঊষার সিঁদুরমাখা আকাশ ঢেকে রাখতে পারলে না পাতলা কুয়াশার পর্দা। খাঁড়ির বুকে এসেছে জোর জোয়ার। জলে জেগেছে কলকল করে কলহাস্য।

রাজার জাহাজ জোড়া এগিয়ে আসছে ধীরে, ধীরে, ধীরে।

মেনার্ড নিজের লোকজনদের ভরসা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলছিলেন, "কোন ভয় নেই—আগে চল্, আগে চল্ ভাই! বোম্বেটেরা বড় জোর একবার কি দুইবার কামান ছোঁড়বার ফুরসত পাবে, তার পরেই আমরা ছুটে গিয়ে হুড়মুড় করে তাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, দেখব তখন পঁচিশটা বন্দুক কেমন করে সামলায় পঞ্চাশটা বন্দুকের ঠেলা! আগে চল্!"

এতক্ষণ পরে কালোদেড়ের মন দোলায়মান হল সন্দেহদোলায়: কুয়াশার ফিনফিনে পর্দা ফুঁড়ে দেখা যাচ্ছে, রাজার জাহাজ দু'খানা এগিয়ে আসছে,—ক্রমেই এগিয়ে আসছে তার দিকে। ঘনায়মান বিপদ! একেবারে শেষ-মুহূর্তেই সে আন্দাজ করতে পারলে, শত্রুরা দলে তার চেয়ে দুগুণ বেশী ভারী! সে স্থির করলে, জাহাজ নিয়ে খাঁড়ির ভিতরে আরো দুর্গম অংশে গিয়ে আশ্রয় নেবে। সে চেঁচিয়ে হুকুম দিলে—"নোঙর তোলো, নোঙর তোলো!"

কিন্তু সময় নেই—সময় নেই! শত্রু যে শিয়রে! পালাবার পথ যে বন্ধ!

কালোদেড়ে কামান দেগে পথের বাধা দূর করতে চাইলে—হাঁ, এই হচ্ছে বাঁচবার একমাত্র উপায়!

প্রচণ্ড চীৎকারে শোনা গেল তার চরম আদেশ—"কামান ছোঁড়ো, একসঙ্গে সব কামান ছোঁড়ো! আগুনের ঝড়ে উড়িয়ে দাও সামনের সব প্রতিবন্ধক!"

কর্ণভেদী বজ্রনাদ ধ্বনিত করে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস কেটে তীব্র বেগে ছুটে গেল সেই সর্বনাশা অগ্নিপিণ্ডগুলো—কিন্তু হায় রে হায়, তারা রাজার জাহাজকে স্পর্শ করবার আগেই জলের ভিতরে ঝুপ্ ঝুপ্ করে পড়ে তলিয়ে গেল!

মেনার্ড বিপুল পুলকে বলে উঠলেন, "গোলাগুলো গিয়েছে জলের জঠরে—আমরা অক্ষত! এইবারে গর্জন করুক আমাদের বন্দুকগুলো—তারা কেউ ব্যর্থ হবে না!"

গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুম্! গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুম্!

রাগে পাগলের মত হয়ে কালোদেড়ে দেখলে, তার দু'জন গোলন্দাজ হাত-পা ছড়িয়ে মৃত্যু-ঘুমে এলিয়ে পড়ল এবং তার জাহাজখানাও চড়ায় আটকে অচল হল! কণ্ঠে তার ফুটতে লাগল প্যাঁচার মত কর্কশ চীৎকার!

আবার গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুম্! ওরে বাবা, গুলির ঝাঁক বন্‌বনিয়ে ছুটছে কানের পাশ দিয়ে—কালোদেড়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি হুম্‌ড়ি খেয়ে বসে পড়ল।

কিন্তু এ কি দৈব-বিড়ম্বনা! হঠাৎ স্রোতের টানে পড়ে রাজার জাহাজ দু'খানার মুখ গেল ঘুরে এবং কালোদেড়েও ছাড়লে না এই দুর্লভ সুযোগ।

তৎক্ষণাৎ লাফ মেরে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে সে গর্জে উঠল—আবার কামান ছোঁড়ো, আবার কামান ছোঁড়ো!"

আবার জাগল কামানগুলোর ভৈরব হুংকার! এবারে তারা ব্যর্থ হল না এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ছাড়লে না বোম্বেটেদের বন্দুকও।

তারপর মনে হল সেখানে সৃষ্ট হয়েছে অভাবিত এক শব্দময় মহানরক! ফটাফট্ ফেটে গেল রাজার জাহাজ দু'খানার নানা জায়গা, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তাদের মাস্তুল, মৃত্যুন্মুখ যোদ্ধাদের চীৎকার ছুটে গেল দিকে দিকে। নৌসেনাদের উনত্রিশজনের মৃতদেহ পড়ে রইল পাটাতনের যেখানে-সেখানে।

বিকট উল্লাসে চেঁচিয়ে কালোদেড়ে ব'লে উঠল, "এবার ওদের পেয়েছি হাতের মুঠোর মধ্যে। আবার ছোঁড়ো কামান-বন্দুক। ডুবিয়ে দাও জাহাজ দু'খানা। মড়াগুলোর সঙ্গে জীবন্তরাও মেটাক্ মাছেদের ক্ষুধা!"

লেফটেনাণ্ট মেনার্ড দিকে দিকে ছুটোছুটি করে নিজের দলের হতভম্ব লোকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। এবং ইতিমধ্যে দুইপক্ষের জাহাজ পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়ল।

মেনার্ড ভাবলেন একবার যদি সদলবলে ওদের জাহাজে লাফিয়ে উঠতে পারেন তাহলে আর কোন ভাবনাই থাকে না! কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝে ফেললেন, ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

দুই পক্ষের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে দেখে কালোদেড়ে নতুন হুকুম জারি করলে—"নিয়ে এস হাত-বোমা! সবাই হাত-বোমা ছোঁড়ো!"

নতুন বিপদের সম্ভাবনা দেখে মেনার্ড নিজের সৈন্যদের ডেকে বললেন, "তাড়াতাড়ি পাটাতনের তলায় গিয়ে গাঢাকা দাও!"

দুই পক্ষের জাহাজে জাহাজে লেগে গেল বিষম ঠোকাঠুকি—শোনা যেতে লাগল মড়মড়িয়ে কাঠভাঙার শব্দ!

দুম্, দুম্, দুম্! বোমার পর বোমা ফাটার বেজায় আওয়াজ, ধুমধড়াক্কা! রাজার জাহাজ দু'খানার পাটাতন ভগ্ন-চূর্ণ, ধূমায়িত, অগ্ন্যুৎপাতে ভয়াবহ। চোখের সামনে যেন মারাত্মক আতশবাজির খেলা দেখতে দেখতে বিকট উল্লাসে কালোদেড়ে অট্টহাস্য করতে লাগল।

এগার

কালোদেড়ে কালগ্রাসে

কালোদেড়ের রোমশ, মদদত্ত ও অমানুষিক দেহ তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে মেনার্ডের "রেঞ্জার" নামক জাহাজের উপরে লাফিয়ে পড়ল এবং তার পিছনে পিছনে অনুসরণ করলে অন্যান্য বোম্বেটেরাও।

হুহুংকারে শোনা গেল তার হিংস্র কণ্ঠে—"সংহার! সংহার! হা রে রে রে! শুরু হোক্ প্রলয়কাণ্ড!"

আচম্বিতে পাটাতনের দরজা ঠেলে কৃপাণ তুলে মেনার্ড ও তাঁর সৈন্যদের আবির্ভাব! ব্যাপারটা এতটা অভাবিত যে বোম্বেটেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত! কিন্তু পলকের মধ্যে নিজেদের হতভম্ব ভাব সামলে নিয়ে তাঁরা সবেগে আক্রমণ করলে—লেগে গেল হাতাহাতি লড়াই! খড়্গো খড়্গো হত্যা-ঝঞ্ঝনা! আগ্নেয়াস্ত্রের ধ্রুম-ধ্রাম্! যোদ্ধাদের গর্বিত বাক্যাড়ম্বর।

তারপরেই অন্য জাহাজ থেকেও মেনার্ডের আরো সৈন্য এসে যুদ্ধে যোগদান করে বোম্বেটেদের অবস্থা করে তুললে আরো শোচনীয়। জাহাজের নীচে জলস্রোত, জাহাজের উপরে রক্তস্রোত!

কালোদেড়ে তখনও ভয় পেলে না—তার একহাতে তরবারি, আর এক হাতে পিস্তল! মৃতদের পায়ে মাড়িয়ে এবং জীবিতদের ঠেলে সে যেন প্রলয়ংকর মূর্তি ধারণ করে একেবারে মেনার্ডের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহগর্জনে বলে উঠল, "আরে রে ঘৃণ্য জীব! নরকে যাবার সময় তোকেও আমি ছেড়ে যাব না!" বৃহৎ তার

রক্তস্নাত কৃপাণ, তাকে ঠেকাতে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মেনার্ডের তরবারি ?

আর রক্ষা নেই। উন্মত্তের মত অট্টহাসি হেসে ও দীপ্ত নেত্রে অগ্নিবর্ষণ করে কালোদেড়ের ভীমবাহু আবার তুললে তার সাংঘাতিক অস্ত্র—কিন্তু পরমুহূর্তে একজন নৌ-সৈন্য ছুটে এসে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার মাথার উপরে করলে প্রচণ্ড আঘাত !

পাটাতনের উপরে ধড়াম্ করে আছড়ে পড়ল বোম্বেটে-সর্দার ! মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক থেকে তাকে ছেঁকে ধরলে নৌসৈন্যের দল এবং তরবারি, ছোরা ও বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সবাই অশ্রান্ত ও নিষ্ঠুর ভাবে বিরাট দেহের উপরে করতে লাগল প্রবল আঘাতের পর আঘাত !

কিন্তু কি অসাধারণ তার সহ্যক্ষমতা ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি ! সেইসব মারাত্মক আঘাতের পরেও সে কাবু হতে চাইলে না, উল্টে দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল এবং তার শেষ পিস্তল তুলে লক্ষ্য স্থির করলে মেনার্ডের দিকে ! ঐ পর্যন্ত ! তার জীবনীশক্তি তখন একেবারে ফুরিয়ে এসেছে, পিস্তল ছোঁড়বার আগেই সে আবার ধপাস্ করে পড়ে গেল এবং তার সর্বাঙ্গে জাগল অন্তিম শিহরণ ! সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে প্রাণত্যাগ করলে।

তার কালো দাড়ি তখন রক্তরাঙা, সর্বাঙ্গও রক্তভীষণ। গুণে দেখা গেল, তার দেহের পঁচিশ জায়গায় রয়েছে পঁচিশটা প্রাণনাশক আঘাতের চিহ্ন !

যুবক যোদ্ধা মেনার্ড নিহত বোম্বেটে-সর্দারের প্রকাণ্ড মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন বিস্ময় প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে। তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছে তার বন্য সাহস !

কিন্তু অভিভূত হলেও মেনার্ড নিজের প্রতিজ্ঞা ভুললেন না। একজন সৈনিককে ডেকে বললেন, "বোম্বেটে-সর্দারের মুণ্ডটা কেটে জাহাজের গায়ে ঝুলিয়ে দাও।"

বলাবাহুল্য, সর্দারের পতনের পর হতাশ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল বাকি বোম্বেটেরাও।

এই ভয়ঙ্কর বোম্বেটে দল দমন করে লেফটেনান্ট মেনার্ড ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।